প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাঘ—১৩৩৮

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

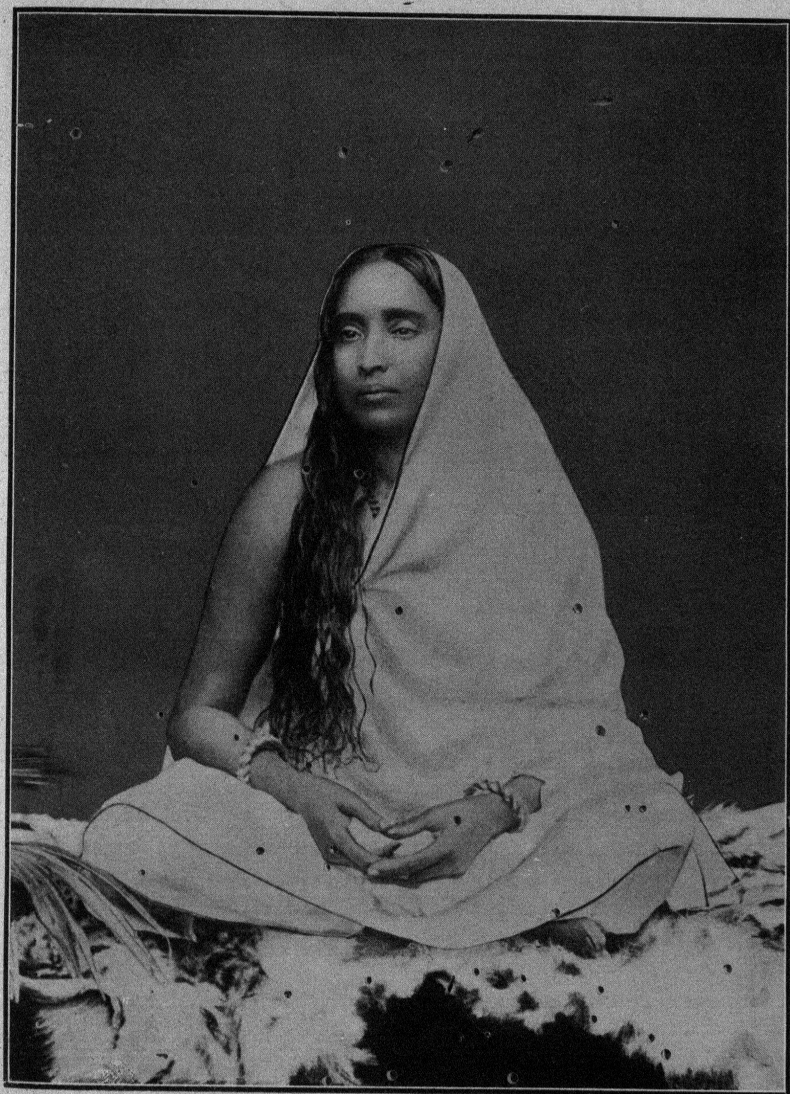


"রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা পণ"

প্রকাশকের নিবেদন

আজ প্রলয়-তরঙ্গে সবই ভাসিয়া যায়, নারীও কি ভাসিবে? যুগস্রোতঃ অনিবার্য্য। জাতি যদি যুগের প্রভাব অস্বীকার করে, বাঁচিবে কেমন করিয়া? কিন্তু আত্মপ্রত্যয়হীন জাতির সে বাঁচার প্রয়োজনই বা কি? ভারতের বর্ত্তমান নারীপ্রগতির ধারা দেখিয়া এই সকল প্রশ্নই মনে জাগে। নারীর আত্মা আজ কোন্ পথ অনুসরণ করিবে?

এই নারীত্বকে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারা যায়, জাতির পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। এই জন্যই মিস্ মেয়ো প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখিকার লেখনী-ধারণ। এই জন্যই মিশনরী খৃষ্টপ্রচারিকার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ভারতের অন্তঃপুরে বিষসঞ্চার। এই জন্যই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দীক্ষা। নারী যদি 'আলোক-প্রাপ্তা' হয়, জাতীয়তা-বর্জ্জিতা হয়, শিক্ষিত পুরুষের ন্যায় বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষাভিমানিনী হইয়া আপন স্বভাব-ধর্ম্ম রক্ষায় উদাসীনা হয়, পরাধীনতার নিগড় অন্তরে বাহিরে পরিয়াও আমরা স্বাধীনতার দান মাথা পাতিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইব না—সে স্বাধীনতা তো ভারতকে পাওয়া নহে, ভারতীয়ত্ব বিসর্জ্জনে 'টবের ফুল' সাজিয়াই আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিব। নিজেরা মজিব—জাতিও নারীশক্তিকেও মজাইয়া ব্যর্থ করিব।



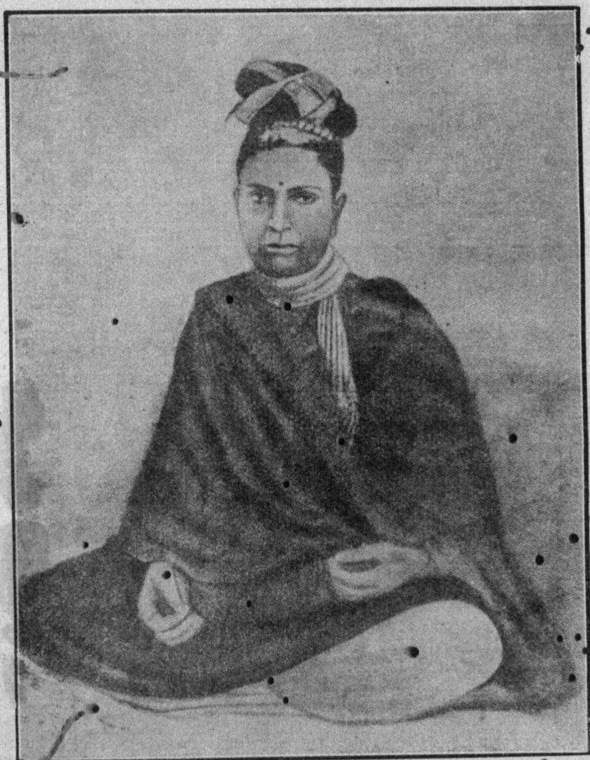
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী

আজ এই ভূম্বা, ব্যর্থ শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধেই লেথক কণ্ঠ তুলিয়াছেন। ইহা শুধু প্রতিবাদ নয়; ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার দর্পণে নারীর নারীত্ব একবার দেখিবার ও দেখাইবার সাধ। "ভারতলক্ষ্মী"—ভারতের নারীজাতি—মা, ভগ্নী, পত্নী, কন্যা—কি ছিল, কি হইয়াছে, কি হইবে—তাহারই আলেখ্য অখণ্ড দৃশ্যপটে আঁকিবার প্রয়াস মাত্র। এই স্বরূপচিত্র যদি একজন ভারত-নারীকেও খাঁটি ভারতীয় ভাবে ভাবুক করে, আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি



দক্ষিণেশ্বরের তীর্থ

বিষয়-সূচী



মাতাজী তপস্বিনী

চিত্র-সূচী



রণরঙ্গিনী সংযুক্তা



যোধাবাঈ ও আকবর



জহরবাঈয়ের রণযাত্রা



অহল্যাবাঈ

ভারত-লক্ষ্মী

প্রশস্তি

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি,
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

কোটি কণ্ঠে এই প্রার্থনার ধ্বনি আজ কেন ভারতের আকাশ বাতাস আর মুখরিত করে না? কণ্ঠ কেন স্তব্ধ, চক্ষু তোদের দীপ্তিহীন, বক্ষে ধমনীর আঘাত কেন নিস্পন্দ?

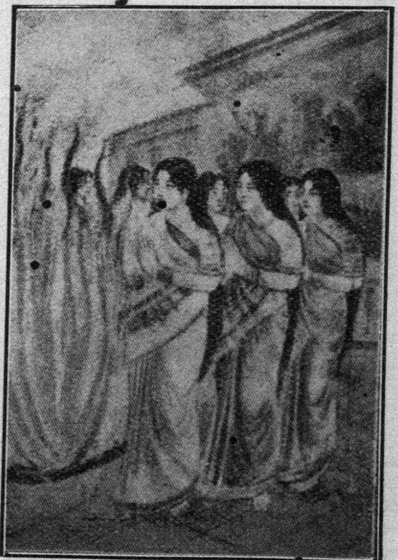
চাহিবার স্পর্দ্ধা কে তোদের চূর্ণ করিয়া দিল, কে তোদের স্বর্ণকান্তি ধূলিমলিন করিল, জয়ের ধ্বজা কেন তোদের মাটীর বুকে খসিয়া পড়িল রে?

যশঃ-মলিন বন্দীজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাভার বুকে বহিয়া ঘন ঘন মরণ-শ্বাস, বেদনার শিহরণে কণ্টকিতকলেবর, রোমকূপে রক্তবিন্দুর ধারা—আত্মহারা জাতি! পূজার মণ্ডপে মঙ্গল-ঘট স্থাপন করিয়া আজ আর তোদের কণ্ঠে বাজে না সে গান—

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥



"মেরি ঝান্সি দেঙ্গে নেহি"



জহর-ব্রত

গর্ব্ব যে জীবনের বীর্য্য, অহঙ্কার যে মেরুদণ্ড; আজ আমাদের স্বাস্থ্য নাই, সৌভাগ্য নাই রূপ নাই, যশঃ নাই, সে শুধু গর্ব্বহীন নির্ব্বীর্য্য জীবনের দায়! সিংহগ্রীব বীরেন্দ্রকেশরী ভারতবাসী অহঙ্কার উদ্বুদ্ধ করিয়া একবার নিজ নিজ অন্তরের মণিকোটায় সন্দর্শন কর :—

ওঁ সুধাব্ধিমণিমণ্ডলরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥

আর উচ্চ কণ্ঠে উন্নত বক্ষ প্রসারিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বল :—

অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভাবিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

আমি অমরশত্রুহন্তা—আমি ত্বষ্টা—আমি রাষ্ট্রী—আমি শ্রেষ্ঠা।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা॥

এই পূজার মন্ত্র ভারতের জীবনযন্ত্রে যে নিত্য ধ্বনি তুলিত, এই শক্তি-ঋকের ঝঙ্কারে যে ভারতের আকাশ বাতাস নিত্য মুখরিত হইত, এই জীবনবেদের উদ্গান যে ভারতের ঋষির কণ্ঠে প্রতি প্রহরে মূর্চ্ছনা তুলিত—ভারতের বীণা আজ কেন মূর্চ্ছিত, কেন তার ছিন্ন তার, কেন সে অনাদৃত,

কেন উপেক্ষায় ধূলিধূসরিত? ওগো ভারতের বাণীমূর্ত্তি, ওগো ব্রহ্মগায়ত্রি, অগ্নিমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রি, মহাদেবি, উঠ, জাগ, আজ পূজার বোধন-দিনে অন্তরে অন্তরে তোমার প্রতিষ্ঠা চাই—তাই যুক্ত-করে তোমায় নমস্কার করি :—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্‌॥

নারীর সঙ্কল্প

নারীর প্রতিষ্ঠা নারীই করিবে। চিরযুগ ইহাই হইয়াছে —আজও তাহার অন্যথা হইবে না। নারী যে আদ্যাশক্তির পরিপূর্ণ প্রতিমা—নারী যে জাতির শ্রী, কান্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উপাসনা, নারীকে অবহেলা করিয়া জাতির অভ্যুত্থান সম্ভব নয়; তাই এই জাগরণের যুগে নারীকেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে—দাঁড়াইতে হইবে আত্মমহিমায়, নারীত্বের অক্ষয় মর্য্যাদার উপর ভিত্তি করিয়া।

যুগযুগান্তরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বার্থান্ধ দুরাচারদিগের হস্তে নারী যখনই লাঞ্ছিতা অপমানিতা হইয়াছেন, তখনই পুরুষের হিয়ায় নারী দুর্জ্জয় শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়াছেন; নারীর সম্মান নারীকেই রক্ষা করিতে হইয়াছে।

সে পৌরাণিক যুগের কথা—শূর্পনখার প্ররোচনায় নিকষানন্দন রাবণ হতবুদ্ধি হইয়া এক ভারতমহিলার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। লোভই পাপের অনুচর; লালসার আগুন যখন মানুষের অন্তরে জ্বলিয়া উঠে, তখন তার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, ভবিষ্য পতনের পথে সে নিঃশঙ্ক চিত্তেই যাত্রা করে। শাস্ত্র, উপদেশ, বিবেক

তাহাকে ফিরাইতে পারে না, স্বার্থপূরণের দুরাকাঙ্ক্ষায় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়—তাই সে আত্মঘাতী হওয়ার পথই শ্রেয়ঃ করে। হীন তস্করের ন্যায় তাই সে একদিন ভারতের তপোবনে সাধুর বেশে প্রবেশ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে ইতস্ততঃ করে নাই। তার পরিধানে শ্লক্ষ্ম বসন, মস্তকে রুক্ষ্ম কেশ, হস্তে যষ্ঠি, চরণে ছিন্ন পাদুকা দেখিয়া ভিক্ষুক বোধেই সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমানা আর্য্যা ভারতী সস্নেহে অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত এই সরল ব্যবহারের প্রশ্রয়ে তাহার তস্কর-বৃত্তিই চরিতার্থ করিয়াছিল। জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় সাধ্বীর অভিসম্পাত সে দিন সে আসক্তির মোহেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই, স্বজনবর্গের সদুপদেশে সে কান দেয় নাই ; তাহার বীভৎস পরিণামের কথা আজ আর বলিবার প্রয়োজন নাই—স্বর্ণপুরী ছারখার হইল, রাবণের পাপরাজ্য ধুলায় ঝরিয়া পড়িল।

পঞ্চবটী আজিও ভারতের তীর্থ, মিথিলা অযোধ্যার পুণ্যস্মৃতি ভুলিবার নয় ; কিন্তু কোথায় আজ স্বর্ণলঙ্কা, কোথায় বিচিত্র অতুল শোভার আধার অশোককানন! পাপকে এমন করিয়া পুড়াইয়া ছাই করিল কে? ভারতের নারী। সে নারীদের গৌরব আজ তোমরা ভুলিবে কি?

আর এক অত্যাচারের কাহিনী অবধান কর। মানুষ কল্পনায় আনিতে পারে না, এমন অকথ্য উপদ্রব নারী চিরযুগ সহিয়াছে। সহিষ্ণুতার দেবি, চক্ষে যে তোমার

অশ্রুকণা ঝরে, তাহা যে প্রলয়াগুন জ্বালাইয়া তুলে। চক্ষে যে কাতর দৃষ্টি, সে যে বিদ্যুৎবৃষ্টি! এই অত্যাচার রাজ্যগর্ব্বপ্রমত্ত, স্বার্থসংরক্ষণে অন্ধ নৃপতির বংশধরগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কাহিনী আজ নারীর চরিত্রগঠনেরই উপাদান।

মানুষের জন্মগত অধিকার অস্বীকার করিয়াই দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হয় নাই—লোভ দুর্ণিবার, জাতিবিরোধের আগুনে নিরন্তর ফুৎকার পাড়িয়া সে নিজেরই চিতাশয্যা রচনা করিয়াছিল; কিন্তু ইহার মূলে ছিল ভারতের নারী।

ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের অন্তরে ঈর্ষ্যাব জ্বালা ধরিয়াছিল। সে দিন তাহার কুপরামর্শের প্রতিবাদ করার সাধ্য কাহারও হয় নাই। সে দিনও তো ছিল ঋষিচরিত্র ভীষ্ম, ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর, ব্রহ্মণ্যক্ষাত্র-শক্তির আধার আচার্য্য দ্রোণ; কিন্তু কৈ সে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা, অকথ্য গর্হিত অপমানের দায় হইতে নারীকে কেহ তো রক্ষা করে নাই! ধরিত্রীর ন্যায় সহিবার সে শক্তির কথা মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। নারী, এই অত্যাচারের প্রতিকার তুমি স্বয়ং করিয়াছিলে! আজও তাই এ জাতি নিঃসংশয়, তোমার মহিমা তুমিই রক্ষা করিবে।

স্বার্থ চিরযুগ ছল ও কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করে। তাই সে দিন দ্যূতক্রীড়ায় বীরত্ব মাথা নত করিয়া রহিল। ফিকিরে ভারতের ধর্ম্ম শক্তিহীন হইল। সর্ত্তবদ্ধ রাজ্যেশ্বর ভিখারী সাজিল। আর চক্ষের সম্মুখে ভারতের বীরেন্দ্রমণ্ডলী

দেখিল—কুললক্ষ্মী দ্রুপদতনয়া বিবস্ত্রা, লজ্জা-সঙ্কুচিতা—কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না। বল দেখি, সে দিন কে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল? ঋতুমতী নারীকে সর্ব্বজন-সমক্ষে বস্ত্রহীনা মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইবার সাহস অর্ব্বাচীন যুগের কোন কবি, কোন সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কি অশ্রু, কি করুণ কাতর দৃষ্টি! বুঝি পাঞ্চালীর চক্ষে বুকের রক্তই ঠিকরাইয়া বাহির হইয়াছিল। প্রলয়াগ্নি ধু ধু করিয়া জ্বলিয়াছিল। পঞ্চভর্ত্তাও সর্ত্তবদ্ধ হইয়া অধোবদনে বসিয়াছিল। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নারীই করিল—পুরুষ নহে!

গ্রহচক্রে দুর্ভাগ্যোদয় বলিয়া নারী কি সান্ত্বনা লইয়াছিল? বিধাতার বিধান বলিয়া এত অপমান নারী কি উপেক্ষা করিয়াছিল? না। অভিমানের অশ্রুপ্রবাহে, প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির হইয়া সে একবিন্দু হলাহল উদগীর্ণ করিয়া দেয় নাই; তিলে তিলে বিষথলি পূর্ণ করিয়া যেদিন তাহা উগারিয়া দিল, সেদিন সেই কুরুবংশ ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইল। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে সেদিন কুলাঙ্গনাদের কণ্ঠে শোকের যে সমুদ্র-রোল উঠিয়াছিল, তাহা এই নারীরই অপমানের প্রতিশোধ। নারীর মহিমা, তার আত্মমর্য্যাদা, তার সুবিমল চরিত্র, সে উহার মহিমা ভাল করিয়াই রাখিতে জানে।

তাই একদিন বনবাসে, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে দ্রৌপদী আলুলায়িত কুন্তল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"এই কেশ, এই

রমণীর ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, গৌরবের জয়কেতন—এই নারীর কেশগুচ্ছ, দুর্ম্মতি দুঃশাসন সবলে আকর্ষণ করিয়া আমায় অপমান করিয়াছে; আর আমায় বিবসনা, বিহ্বলা, অসহায়া বেশে দাঁড় করাইয়া দুর্য্যোধন উরুদেশ দেখাইয়া ধৃষ্টতার সীমা রাখে নাই। আমি এই কেশ অবেণীবদ্ধ রাখিয়াছি—চাই প্রতিশোধ, এ সঙ্কল্প কি ব্যর্থ হইবে?"

স্ফুরিত অধরে গদগদ্ এই অটুট সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি, রোষগর্ব্বোজ্জ্বল নয়নের সে দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণকেও চঞ্চল অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। কে বলিবে—কুরুক্ষেত্রের রণরঙ্গে শপথ ভঙ্গ করিয়া, রথচক্র উঠাইয়া শত্রুনিধনের উদ্যমের মূলে সতীর এই ক্রোধবজ্রই নিহিত ছিল না? আর দুঃশাসনের বক্ষে বসিয়া ক্রোধোন্মত্ত বৃকোদরের রক্তপান, দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে ভূপতিত করিয়া তাহার উরুযুগল ভীমপ্রহারে বিচূর্ণপূর্ব্বক কণ্ঠে সেই যে ভীম অট্টহাস্য, তাহা এই নারীর প্রতিশোধকামনারই কালানল ছাড়া অন্য আর কি হইতে পারে! নারীর সঙ্কল্পই যে পুরুষের বীর্য্য। সে নারীত্বের মহিমা কালের আবর্ত্তে কি আজ নিঃশেষ হইয়াছে? —না, নারীলাঞ্ছনার প্রতিশোধকামনায় পাঞ্চালীর ন্যায় ব্রতধারিণী রমণীর অভাব এদেশে হইবার নহে।

নারীনির্য্যাতনের যুগ আজিও শেষ হয় নাই। সেদিন মানুষের স্বার্থ, কুল, বংশ, ব্যক্তিগত কামনাকে ঘিরিয়া উৎকট কামনা সৃষ্টি করিত; আজ তাহা সর্ব্বজাতি সর্ব্বদেশকে গ্রাস করিয়াছে। সেদিন জনক-দুহিতা সীতার

রূপলাবণ্যে মুগ্ধ রাবণের চিত্ত প্রমত্ত হইয়াছিল, রোহিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্ভোগে রাহুর প্রমাথী ইন্দ্রিয় অধীর হইয়াছিল, পাঞ্চালীর যৌবনজোয়ারে মত্ত হস্তী জয়দ্রথ কীচক ঝাঁপ দিয়া বিপন্ন হইয়াছিল ; নারীকে কলঙ্কিত করার এই যে নীচ প্রবৃত্তি, আজ যুগপ্রভাবে কি যে ব্যাপক সূক্ষ্মগতি ধরিয়া এই প্রাচীন জাতির নারীগৌরব ম্লান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। আজ শত্রু প্রকাশ্য নহে, প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া জাতির মূল এই গর্ব্বকেন্দ্রে আঘাত দিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা আমাদের কল্যাণ, যাহা সম্পদ্, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা অপহৃত হয়, জাতির চেতনা, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি যাহাতে চিরমলিন হয়, আজ তাহার আয়োজন, তাহার আসুরিক প্রয়াস অন্তরে বাহিরে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এ জাতি নারীর আসন কত ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া অন্তরপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছিল, তাই দিগ্বিজয়ী বীরের মত পৃথিবী শাসন করিয়াছিল! নারী ছিল এ জাতির শক্তি, শান্তি—নারী ছিল শ্রদ্ধার প্রতিমা, গৃহলক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী ঋদ্ধি, ধাত্রী—এই মহাশক্তি যদি গ্লানিলিপ্তা হইয়া পড়ে, তবেই আমরা স্পর্দ্ধাহীন হইব, চিরপঙ্গু হইব। তাই আজ ভাবিবার কথা। আমাদের ঘরের মটকায় আগুন ধরিয়াছে। নারীলাঞ্ছনার অভিযান আর আততায়ীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হয় না—আমাদের অন্তঃপুর আক্রমণ করিয়াছে। এ বিপদ্ হইতে অতীতের ন্যায় এ যুগেও নারীকেই আত্মসঙ্কল্প-বলে রক্ষা পাইতে হইবে।

বাহির হইতে যে আঘাত আসে তাহার প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু অন্তরে বিষসঞ্চার হইলে তিলে তিলে মৃত্যু অবধারিত। আজ বাঁচিতে হইবে ভিতরের দিক্ হইতেই—হলাহলজর্জ্জরিত দেহ মনের রন্ধ্র হইতে কলুষ নিষ্কাসিত করিতে হইবে। তাই চাই বিশুদ্ধশক্তির উদ্বোধন, নারীর অকুণ্ঠিত আত্মদান। ভারতের নারী আবার মাথা তুলিবে—আবার আমরা বীরজাতি বলিয়া জগতের পূজা পাইব।

হিন্দু বিধবা

সমাজসংস্কারের ধূয়া ধরিয়া আজ বিধবার একটা গতি করিতে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি। আমাদের মনে রাখা উচিত—সহজ পথটাই সমাজশক্তি বৃদ্ধি করে না, একদিক্ রক্ষা করিতে গিয়া অন্যদিক্ নষ্ট হইয়া যায়। বিধবার রক্ত-মাংসের ক্ষুধানিবৃত্তি যদি সমাজকল্যাণের কারণ হইত, তাহা হইলে ইউরোপের সমাজ-সমস্যা ক্রমেই কঠিনতর হইয়া উঠিত না। আপাত-সুখের পথে আমরা ছুটিয়াছি; আবার নূতন বিপদ্ ডাকিয়া আনিব। আমরা যেন কলুর বলদের মত একই পথে ঘুরিয়া মরিতেছি, মুক্তির তপস্যা জাতির জীবনে নামাইয়া আনিতে সমর্থ হইতেছি না। আজ দেশে অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা অল্প নহে, বিধবার সহিত ইহাদের পার্থক্য—এই সকল বয়স্কা কুমারীদের সুখের আশা পুড়িয়া ছাই হয় না। বিধবার হৃদয় শ্মশান হইয়াছে; কিন্তু এই শ্মশানবুকেই যদি কালীর নৃত্য হয়, তবে সমাজের আর একপ্রকার শ্রী ফুটিয়া উঠে। সে তপস্যার বীর্য্য আমরা হারাইয়াছি; কাজেই হিন্দুসমাজে বিধবার যে পবিত্র স্থান, তাহাদের যে কল্যাণমূর্ত্তি, তাই আর ফিরিয়া পাইব না। কিন্তু নারীর অপমান ইহাপেক্ষা অধিক কি

হইতে পারে, যে ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণুতার দেবীকে আমরা কামনার আগুন হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছি কামনার পূর্ত্তি দিয়া? নারীর হিয়ায় ব্যথার ,রাগিনী কি এই তুচ্ছ বিষয়সম্ভোগে তাহারা বঞ্চিতা বলিয়া? এত তুচ্ছ নারী কেন, পুরুষকেও আমরা ভাবিতে পারি না! মানুষকে এমন ক্ষুদ্র করিয়া যে জাতি দেখে, সে জাতির ভবিষ্যৎ নাই। এই মনোবৃত্তি-বশতঃই আমাদের সমাজ বিদেশীর চক্ষে কত হেয় রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহা একজন ইংরাজের এই কথায় প্রমাণ হয়—"বিধাতার অভিশপ্ত রূপে ভারতের তিন কোটি বিধবা গৃহে শৃগাল কুক্কুরের মত, আর বাহিরে গণিকাবৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করে!"

এই কথা শুনিয়া বিধবা জননীর দিকে ভারতবাসী কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে, বৈধব্যব্রতচারিণী তপস্বিনী সহোদরা থাকিলে সেদিকে আমাদের অশ্রুসজল নয়ন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়; কর্ত্তিতকেশা, নিরাভরণা, স্বামীধ্যাননিরতা, বিরহবিধুরা বিধবা দুহিতার দিকে ব্যথিত জনক দৃষ্টিপাত করে, আর্ত্তকণ্ঠে এই প্রশ্নই উঠে, 'মা, ভগ্নি, দুহিতা, তোমরা কি শৃগাল কুকুরের মতই নির্য্যাতিতা, বারবনিতা—হিন্দু বিধবার কি ধর্ম্ম নাই, ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই?' এই কথা ভাবিলে বক্ষের রক্ত যে চক্ষে উৎসের সৃষ্টি করে, প্রাণে শেল বিদ্ধ হয়, নারীজাতির প্রতি এমন লাঞ্ছনার বাণী কেমন করিয়া কাণ পাতিয়া শুনি—ভাবিয়া আকুল হই!

বিধবার প্রতি হিন্দুভারতের কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, কি

সশ্রদ্ধ সতর্কদৃষ্টি, তাহা ঋষিতুল্য ভূদেব বাবুর উক্তিটুকু হইতেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ, স্বার্থপর জাতিও বুঝিবে—বুঝিবে, হিন্দুবিধবার স্থান আমরা কত ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলাম, হিন্দুসমাজ বিধবার প্রতি কত বড় সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিল। আমরা আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল বিধবা নয়, পত্নীপুত্রের প্রতিও সমাজসঙ্গত যথারীতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না—কে আমাদের তিলে তিলে এই সামর্থ্য, এই সাধ্যের মূল ক্ষয় করিয়া আমাদের এমন করিয়া নিরুপায় করিল?

ভূদেববাবু বলিয়াছেন:—"বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ...ী পরার্থে আত্মোৎসর্গ; আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়·.....এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্দ্ধারিত, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়, স্থল-বিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এইজন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল তাহা বুঝিতে পারে না, সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম!" বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মত যায়। সে একেবারেই উদাসিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।"

"ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্য-সাধারণের মনের ভাব কি হয়? সকল মনুষ্যই সংসারবিরাগীদিগের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং অবিচলিত

শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী।”

বিধবার প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হিন্দুসমাজের সনাতন বিধি। বিধিপালনে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থাই আমাদের পুরাণে, সাহিত্যে, ইতিহাসে আছে। ভূদেব বাবুর কথা “যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই যেন বিধবার প্রকৃত অবস্থা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত না হয়েন। সে বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে, যে বিধবা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়াছে। দৈববিড়ম্বনা কর্ত্তৃক সেই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, অতএব সে একান্ত দয়ার পাত্রী। এমন উচ্চ ব্রত ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিশেষরূপেই ভক্তি করিতে হইবে।”

বিধবাপালনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে—হিন্দুসমাজ বিধবাকে কি ভাবে প্রতিপালন করার আকাঙ্ক্ষা রাখে,—

“(১) বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে, কর্ত্তা স্বয়ং ইহাকে আহারের নিয়ম করিয়া দিবেন। এই দুগ্ধ, এই ফল, এই অন্ন-ব্যঞ্জন বিধবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেমন দেবতার নামে যে দ্রব্যাদি সমাহৃত হয়, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও খাওয়াতে নাই, তেমন বিধবার নিমিত্ত যাহা বাটীর কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও প্রদান করিতে নাই।

(২) বিধবার শয়ন দুই একটী শিশু সন্তানের সমভিব্যাহারে করাইবে। বিধবাকে ছেলেদের আব্দার সহাইবে।

(৩) বিধবাকে সাংসারিক কার্য্যে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। শুধু অনুজ্ঞা দ্বারা নয়, বিধবাকে সধবা স্ত্রীলোকদিগের গৃহকার্য্যের সহকারিণী করিয়া দিবে।

(৪) বিধবাকে সংস্কৃত শিখাইবে, অন্ততঃ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনাইবে, এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবে।

(৫) বিধবাকে ব্রতাদি করিতে দিবে।......ব্রতাদি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে না।.........ইত্যাদি।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বিধবার জন্য সুপালিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকল গৃহস্থের আছে এবং "যে পরিবারের মধ্যে এইরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রী পুরুষেরা নিরন্তর ঋষিচরিত্রের দ্রষ্টা ও ফলভোক্তা। তাহারা 'পরার্থ জীবন' ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না এবং পুস্তকে পড়ে না, উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।"

এই আদর্শে হিন্দুসমাজ গর্ব্বিত, এই আদর্শে হিন্দুজাতি বিধবাকে সংসারে দেবীর আসন দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে; কিন্তু দারুণ অন্নাভাব আমাদের বনীয়াদ টলাইয়াছে, আজ যে কাঙাল হইয়াছি, পথের ভিখারী যে সে যে লাঞ্ছনা সহিতেই জন্মিয়াছে—তবুও এই তিনকোটী বিধবাই সমাজের প্রাণশক্তি; রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, ধর্ম্মকার্য্যে অগ্রণী হইয়া, পতিত জাতির গৃহলক্ষ্মী ইঁহারাই

এখনও বিধবা মাতা, বিধবা ভ্রাতৃজায়া, বিধবা ভগ্নী, বিধবা দুহিতা, বিশিষ্ট বিশিষ্ট সংসারে গৃহকর্ত্রীরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী। তাঁহাদের শাসনেই গৃহস্থ-জীবনে চরিত্র, ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম অব্যাহত। অঙ্গনে তুলসীমঞ্চ, পূজার দালানে ধূপধুনার গন্ধ, উৎসবে পর্ব্বে ঘরে ঘরে আনন্দের রোল বিধবার আত্মদানেই বজায় আছে। ভারতের বিধবা দেবীর আসনে উপবিষ্টা; বিধবার অপমানে দেবতার অপমান। বিকৃত বুদ্ধিবশতঃ যেখানে হিন্দু ইহার অন্যথা করিয়াছে, হিন্দুসমাজশক্তির মূলেই সেখানে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। আমরা অভারতীয় চরিত্রপ্রভাবে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তাই অধঃপতনের আর সীমা নাই।

বিধবার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ যে ঘরে হয় তাহা শিক্ষার অভাব—তাহার প্রতিকার শিক্ষার ভিতর দিয়া পূরণ করিতে হইবে। যদি হিন্দুসমাজে শিক্ষা সাধনার প্রবর্ত্তন হয়, তবে অবধারিত তিন কোটি বিধবা হিন্দু সমাজের শ্রী ও প্রভাব রক্ষায় আবার সমর্থা হইবে। সমাজের আদর্শপালনের ব্যবস্থা হিন্দু-বিধবার উপরেই অনেকখানি ন্যস্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি ভোগের কৃমি নয়; হিন্দুর ব্যবহারিক সম্বন্ধের ভিত্তি ধর্ম্ম। প্রেম তার উপাদান। নারী স্বামীহীনা হইলে, প্রেমের দায় হইতে মুক্তি পায় না। তাই যাবজ্জীবন তাহাকে বিদেহ স্বামীর উদ্দেশ্যে কঠোর তপশ্চরণ গ্রহণ করিতে হয়। সমাজশৃঙ্খলারক্ষার শক্তি যদি আমাদের অটুট থাকিত, তবে আজিও আমরা দেখাইতাম—বিধবাই দেশে

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষাসাধনার অধিনেত্রী ; বিধবা যে উৎসর্গযজ্ঞের বিশুদ্ধ অগ্নিশিখা, জাতির পুরোভাগেই তাহাদের স্থান। আমরা বিধবাকে যেন বৈধব্যের পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারি ; প্রাকৃত জীবনের দায়কে বড় করিয়া সমাজের নারীজীবন কলঙ্কিত করার পাপ হইতে ভগবান এ জাতিকে রক্ষা করুন !

নারীলাঞ্ছনার উদ্দেশ্য

জগতের কোন জাতির মধ্যেই ভারতের সমাজ-শাসন-ব্যবস্থার মত সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের মধ্যে পশুভাব সকল দেশেই আছে; কিন্তু ভারত চাহিয়াছিল সুকৌশলে এই পশুপ্রকৃতির রূপান্তর সাধন করিয়া জাতিকে দিব্য করিতে—সে মহাযজ্ঞ সিদ্ধ হওয়ার পথে, যুগে যুগে হিমালয়ের মত বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই এ জাতি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন ভুলে নাই, আদর্শ ম্লান করে নাই; তাই বিরোধেরও অন্ত নাই।

কোন বিশিষ্ট জাতি ও ব্যক্তি ভারতের আদর্শ সমাজের ভিত্তি নষ্ট করার আয়োজন করিতেছে বলিয়াই আমাদের বিচলিত হওয়ার কারণ নাই; আসল কারণ হইতেছে, জগতের যে অনৃত ও অসত্য তাহা এই জাতির সত্য ব্রত সিদ্ধ হইতে বাধা দিতেছে, সেই মিথ্যাই নানা মূর্তিতে আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে। বিজাতি বিদেশীকে আশ্রয় করিয়া এই পাপের রাষ্ট্র-মূর্তি তত ভয়ঙ্কর নয়, যত ভয়ঙ্কর আমরা নিজেই; কেননা বিকৃতবুদ্ধি হইয়া আমরা যখন নিজেদের ঘর নিজ হাতেই কলুষিত করি, তখন নিরুপায় হইয়া পড়িতে

য়। আজ যুগ যুগান্তরের নারীর আদর্শ সতী, সাবিত্রী, ময়ন্তী, অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী, যিনি স্বামীর জীবনের বাঝা জীবনভোর বহিবার জন্য চক্ষে বসন বাঁধিয়াছিলেন—াহাদের চরিত্র ধূলিসমাচ্ছন্ন করি; অর্ব্বাচীন যুগের ল্যহীন ঔদার্য্যে ও অন্তঃসারশূন্য কল্যাণকামনায় ব্যথিত ইয়া নারীর চরিত্র বিপরীত ভাবে গড়ার পক্ষপাতী হই—ারতের এই অদ্বিতীয় আদর্শ ও সভ্যতার মূলে আমরা য পাপগ্রস্ত হইয়াই আঘাত দিতে উদ্যত হই, ইহা ভাবিয়া ক্ষে আর অশ্রুসম্বরণ হয় না। অপমানের ধূলি তাই র্ব্বদিক্ হইতে ভারতের নারীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হয়। াপের স্বার্থরক্ষার দায়ে, এই পবিত্র হিন্দু জাতির মাথা-্যথা দেখিয়া প্রতিবাদ করিব কি, স্তম্ভিত হই; ভারতের ানুষ পশুর ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ করিবে, ইহা ধারণা করিতেও মাথা ত হয়!

যে শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে আমরা আবার আত্ম-ন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া মাথা তুলিব, তাহার মূলক্ষয় করার চণ্ড আয়োজন চতুর্দ্দিক্ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; কবার আত্মস্থ হইয়া যদি দেখি, তবে ইহার কারণ সহজেই যায়। জগতে একমাত্র ভারতের হিন্দু-ধর্ম্ম শিবরাত্রির মত একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন আদর্শবাদ লইয়া সহস্র র্য্যাতনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। এই ক্ষীণ আলোক-খা মুছিবার ব্যবস্থা না হইলে জগৎ আজি যে ধর্ম্মটাকে ণ করিয়া লইয়াছে তাহা দিগ্বিজয়ী হয় না; কাজেই

ভারতের পুণ্যপ্রদীপ নিবাইবার প্রয়াস দুর্জ্জয় মূর্ত্তি ধরিবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে।

পাশ্চাত্যের জয় প্রাচ্যকে আত্মসাৎ না করিলে সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের হাতেই শাসনযন্ত্র বিধাতা তুলিয়া দিয়াছেন—সে যন্ত্রের পীড়নে একটা জাতির অতীতকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়—শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম বিকৃত করারই প্রয়োজন হয়; তাহা আজ অব্যর্থ গতিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যে আমাদের গৌরবকাহিনী উপহাসে উড়াই, সে অপরাধ এই পাপেরই ছলনা; আজ এই পাপই অন্তঃপুর কলুষিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভারতের নারী জাতির মুক্তিবিধাত্রী। আজ আর ভারতের আদর্শ নয়, ভারতের নারী নয়, পাশ্চাত্য প্রভাবের মূর্ত্তিমতী করুণা নানারূপে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দয়াপ্রকাশে উদ্যতা, অভিমন্যুর মত আজ সপ্তরথীবেষ্টিত ভারত বুঝি আর রক্ষা পায় না! ভারতের মাতৃত্বও আজ বিদেশিনী রূপসীর চরণপদ্মে অর্ঘ্য দিয়া, দুঃখিনী ভারতের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছি! আজ যে সব বিদুষী ভারতের শোভা, তাঁরা ভারতের দুরবস্থার যুগে তার অতীতকেই দোষ দিয়া ভারতীয় ভাব হইতে শনৈঃ শনৈঃ দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। দেশের শতকরা সাত জন পুরুষও শুধু এখনও জগতের নূতন শিক্ষায় সাধনায় দীক্ষিত হয় নাই; না জানি, নারী পুরুষ মিলিয়া পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও আদর্শে একযোগে যদি দীক্ষা লইতে ছুটে, আমাদের দুর্দ্দশা

কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে! নির্লজ্জের মত দেশের অনেক মনীষী বলিবেন—ভালই হইবে, এই বিশকোটী লোকের ঘুঘুর বাসা পুড়িয়া ছাই হইবে, আমরা অভিনবকে বরণ করিয়া ধন্য হইব। হায়, পরাধীনতার মোহ! এই সন্ধিযুগে ধন্য ভগবানের দয়া, যিনি সত্যকে চিরযুগ রক্ষা করেন; তাই একজন মানব-প্রতিনিধির কণ্ঠে উচ্চ ধ্বনি উঠে—"Our ancient school-system is enough······we consider your (modern) schools to be useless."—আমাদের শিক্ষাবিধানই যথেষ্ট, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা আমরা কোন কাজের নয় বলিয়াই মনে করে। ভারতের ভিক্ষুক মহাত্মাকে এইজন্যই এই ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া ভূনত প্রণিপাত করি।

প্রতিকার

আজ আমাদের মধ্যে প্রাচ্য ভাবে ও আদর্শে বাঁচার প্রেরণা এই মরা জাতির মধ্যে পুনরায় জাগাইতে হইবে। জাতির ভবিষ্যৎ শুধু পুরুষের উপরেই নির্ভর করে না। ইংরাজ-শাসিত ভারতের চব্বিশ কোটী লোকের মধ্যে বার কোটী নারী নিরক্ষরা। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া নহে। লাট, ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নীর সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়া, অন্তঃপুরের শিক্ষা যেন আমরা অন্তঃপুর-মহিলার মধ্য দিয়াই সফল করিতে পারি, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতের নারীর পক্ষে সেমিজ, বডি পরিয়া শিল্প ও সভাসমিতিতে যোগদান দিবার অধিকারলাভের শিক্ষা অপেক্ষা যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তাহাদের আদর্শ, দেশ ও জাতির সহিত অচ্ছেদ্য প্রাণ লইয়া তাহাদের দীনদরিদ্র লাঞ্ছিত পতিপুত্রের পাশে মৃত্যুপণে দাঁড়াইতে পারে, সেই সুশিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা।

তাহাদের মৃত পতির প্রাণ দান করিতে হইবে, রুগ্ন পুরুষের শিরায় শিরায় স্নেহ অনুরাগের অশ্রু ঢালিয়া জাতির পৌরুষবৃদ্ধি করিতে হইবে, পাশ্চাত্যের শিক্ষায় ভারতের

নারী যেন পতিসেবার ব্রত দাসমনোবৃত্তির পরিচয় বলিয়া পবিত্র হিন্দুগৃহ কলঙ্কিত না করে।

হিন্দু নারী! তোমার আদর্শ তোমার অতীতকে দেখিয়া স্থির কর, তোমার শিক্ষা তোমার গৃহপ্রাঙ্গনের ধূলিকণা হইতে কুড়াইয়া লও। ভারতের লক্ষ্মী শিক্ষার অভাবে পরিম্লান; আবার কুশিক্ষার প্রভাবে তাঁহাকে চঞ্চলা করিও না। জাতির পৌরুষ ফিরাইয়া দাও, এই শিক্ষার আদর্শ, এই চরিত্রের পবিত্র স্মৃতিগৌরব নারীলাঞ্ছনার প্রতিশোধরূপে আমরা ধরিব। অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান দুর্দ্দশার চিত্র স্মরণে আনিয়া সাধিত হয় না, আশার আলোই জ্বালিতে হয়; তাই ভারতের নারীগৌরব কীর্ত্তন করিয়া আমরা যথার্থ প্রতিকারের কথা কহিব। হে ভারত! আর ঘুমাইও না; উঠ, জাগ, মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যে আদর্শ আছে, জীবনের পশ্চাতে ভগবানের অনাহত পাঞ্চজন্য আজিও যে নীরব নয়, তাহা জীবন দিয়া সপ্রমাণ কর।

বাল্যবিবাহ, নারীর পর্দ্দা, বৈধব্য প্রভৃতি হিন্দুর অন্তঃপুর-ব্যাপার লইয়া পাপের অনুচরবৃন্দ জগতের নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, যে ভারত আজিও আলোর মুখ দেখে নাই; ইহার জন্য একদিকে ইংরাজের সুশাসন, অন্যদিকে আমেরিকান মিশনরীদের অনুগ্রহ, এই দুইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভারতের মুক্তিদাতৃরূপে তাঁদের এই অযাচিত করুণা কতখানি নিঃস্বার্থপরতার লক্ষণ, তাহা আর বলিতে হইবে না।

আমাদের সামাজিক দুরবস্থা যে চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং কালের আবর্ত্তে ভারতের ভাগ্যে পরাধীনতার বন্ধন দৃঢ়তর হইল ঠিক সেই সময়ে যে সময় জগতের উন্নতি-যুগ। কোথায় ছিল ইউরোপ আমেরিকা—যখন ভারতের মৌর্য্য-সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখায় উঠিয়াছিল? প্রাচীন ভারতের সমবায়প্রথা, স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষতা, দেশের শান্তিশৃঙ্খলাবিধানের ব্যবস্থা, বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের অভাব সে দিন ভারতে ছিল না। সে অতীতের গরিমা বর্ণনা করিয়া আজ লাভ নাই; তবে ইহা সত্য, অশোকের কীর্ত্তি যেদিন জগতে জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিল, সেদিন আজিকার এই অর্ব্বাচীন জাতি, মাতৃকুক্ষি হইতে বাহির হয় নাই। এই বিশাল প্রাচীন জাতি বহু সহস্র বর্ষ পৃথিবীর কল্যাণে উদ্যত ছিল। প্রকৃতির বিধানে, তার বিশ্রামযুগে—পাশ্চাত্যের আবির্ভাব। নবীনতার লঘু পুলকে আত্মহারা তরুণ, কি বিপুল জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী এই ভারত তাহা অনুভব করার মস্তিষ্ক এখনও তোমাদের যথাযোগ্য পুষ্ট হইয়া উঠে নাই, তোমাদের কথার উপর কথা কহিতে আমাদের লজ্জা হয়!

আমরা অমর জাতি, মৃত্যু আমাদের ধ্বংস করিতে পারে না। জীবনের প্রেরণা আবার জাগিয়া উঠিতেছে; জাতিকে উঠিতে হইবে। আজ তাই দৃষ্টি আমাদের অন্তরের দিকেই দেওয়া চাই—জড়ত্বের যুগে যে পাপ সমাজে, ধর্ম্মে, সর্ব্বক্ষেত্রে

ঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ নিরসন করার জন্য আমাদের উদ্যত হইতে হইবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৪০ জন বালিকার বিবাহকাল ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহার অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া বর্ত্তমান যুগে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইলেও, যদি সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, আমাদের মনে হয়—এই বয়সই বিবাহের প্রশস্ত কাল।

আধুনিক দিনে বয়ঃস্থ পুরুষ বয়স্থা নারীর পাণিগ্রহণ অধিক পছন্দ করেন; কিন্তু বাল্যবিবাহের মধ্যে যে মধু, যে তৃপ্তি তাহা হইতে ইঁহারা বঞ্চিত হন। যাহাকে জীবনের সব কিছু দিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহাকে যদি মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া না যায়, অথবা দুই জনে এক সঙ্গে হৃদয় মন গড়িবার অবকাশ না পায়, তেমন অভেদস্বরূপ-বোধ হইয়া উঠে না, সভ্যতা ও আদর্শের আড়ালে স্বামী-স্ত্রীকে যেন একটু সতর্ক থাকিয়া চলিতে হয়—জানি না, ইহাতে অখণ্ড প্রেমের আস্বাদ মিলে কি না!

ভূদেববাবু বাল্যবিবাহের গুণটুকু দেখাইয়া এক স্থানে বলিয়াছেন—বিপত্নীক পুনঃ পত্নী গ্রহণ করিয়া সাহেবদের মতই বলেন—"and such was she"; "কিন্তু আমাদের আর 'সেও এমন ছিল' একথা বলিবার যো নাই। তুমি বা উনি ঠিক তাহার মত—আমি কাহাকে এ কথা বলিব? আর কেহ কি আমার নিজের হাতে-গড়া, গায়ে-মনে-ধরা জিনিষ? আমরা ছেলেবেলা দুজনে মিশেছিলাম, আমি

তাহাকে নিজের মনের মত ক'রে তুলেছিলাম, নিজেও তাহার মনের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং সে যে ছিল তাহার নিজের মত, আর আমার মনের মত। অপর কেহ আর তেমন থাকিতে পারে না। আর কেহ তাহার চেয়ে ভাল থাকে থাকুক, কিন্তু তেমন থাকিবে কেমন করে' ?"

স্বামীস্ত্রী উভয়ের মধ্যে এই মনোভাব যদি দৃঢ় হয়, তবে বল দেখি—ভারতে বিপত্নীক পুনঃ পত্নী গ্রহণ করিতে পারে কি ? আর সাধ্বী পত্নী প্রেমের এই অমৃত পান করিয়াই স্বামীর নশ্বর শরীর পরিত্যক্ত হইলেও, তপস্বিনী বেশে থাকা ছাড়া তার আর উপায় থাকে কি ?

পতন-যুগে ব্যবস্থার বিকৃতি উপস্থিত হয় এবং যুগোপযোগী পরিবর্ত্তনও প্রয়োজন হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাদের অবস্থা যে সঙ্কটময়—তাই যাহা ভাঙ্গে তাহা আর গড়া যায় না, কদাকার দিক্‌টাই বাহির হইয়া পড়ে। নিরুপায় জাতির এই দুরবস্থার ছবি আঁকিয়া জাতির সত্য রূপ বলিয়া জগতে প্রচার করার ধৃষ্টতা যাহার, সে যে একান্তই হীনচিত্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা পঞ্চম বর্ষে, বাংলার নবযুগপ্রতিষ্ঠাত্রী মহাদেবী শ্রীমাকে ষষ্ঠত্রিংশবৎসরবয়স্ক যুবকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখি। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অশিক্ষিতা পল্লীবালিকার জীবন কি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল পবিত্র প্রদীপের মত নারীজীবনের আদর্শস্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিলে জগৎ স্তম্ভিত হইবে।

এইরূপ মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত হিন্দু-সমাজে আজিও বিরল হয় নাই। চৌদ্দ কোটী নারীর মধ্যে প্রকৃতির অত্যাচার যেখানে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে, সেই বিকৃত রূপটী খুঁজিয়া বাহির করিলেই, ভারতের আদর্শ খাট করা যায় না। হিন্দু অন্তঃপুরে বিধবার শুভ্র পবিত্রতা সমাজশাসনের পীড়নে রক্ষিত হয় না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রেমের ধ্যানে তাঁরা তন্ময়া হইয়া আছেন—পাশ্চাত্যের বিলাসদৃষ্টি এ মর্ম্ম বুঝিবে না, ভগবান তাঁহাদের বুঝিবার অধিকার দেন নাই।

স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে হিন্দুনারী অবহেলে যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দেয়, নারীজীবনের সার্থকতা যে সন্তান-মুখদর্শন, যে নারী তাহা হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে, প্রেমের জন্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া পূত সংযমে জীবন পবিত্র করে, সে নারীর পদরেণু মাথায় করিলে পাশ্চাত্যের নারীসমাজ ধন্য হইবে। তাহাদের ভারতনারীর পদতলে মাথা রাখিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। সমাজের উন্নতি-শ্রী-শোভাবৃদ্ধির জন্য নারীজীবনের পবিত্রতা কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়—সন্তান-জন্মরোধের জন্য পাশবিক বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে না—স্বামীর প্রয়োজনে কি অফুরন্ত আনন্দের সহিত পত্নী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করে, তাহা হিন্দুগৃহে আশ্চর্য্য কথা নয়। আমরা ইচ্ছা করিলে শতকরা যাট জন স্বাধ্বী পত্নীর সংখ্যা এই পতনের দিনেও গণিয়া বাহির করিতে পারি। আজ দেশের সমাজ-জীবনে যেটুকু পাপের আগুন

ধরিয়াছে তাহার একতৃতীয়াংশ পাশ্চাত্য সভ্যতার রাক্ষসী তাড়নায়, আর অপর চতুর্থাংশের অর্দ্ধাংশ অভাবের বৃশ্চিক-দংশনে। বাংলার যে কোন দুশ্চরিত্রা হিন্দু-নারীর নিকট পৌরাণিক যুগের সাধ্বী পত্নীর করুণ কাহিনীটুকু শুনাও, দেখিবে—তাহাদের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু উথলিয়া উঠিবে। হিন্দুর ধাতু ভাগবত, প্রতিকুল ক্ষেত্রে পড়িয়া অসুরশক্তি গ্রাস করিয়াছে। এ পাপের প্রভাব আমাদের অন্ধতা, ধর্ম্মের নামে ঘোরতর তামসিকতাকে প্রশ্রয় হেতু ঘটিয়াছে; কিন্তু দেশে পুনরুত্থানের ঝড় উঠিয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে জাতীয় মহিমা এমন করিয়া ঢাকা দেওয়া আর সম্ভব হইবে না। সমাজ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে রাজশক্তি শুধু হাত দিবে না, এরূপ নহে; পরন্তু বাধা দিবে না, এইটুকু স্পর্দ্ধা দেখাইলে জাতি প্রমাণ করিতে পারে—ভারতের সমাজ আর অধিক দিন এরূপ অনুন্নত থাকিবে না। কিন্তু অভ্যুত্থানের সত্য সূচনা দেখা দিলেই আমরা যে অকারণ বাধা পাইব, ইহা অবধারিত; অতএব যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষে অপব্যয় করিয়াই আজ আমাদের জীবনের পথে দৌড় দিতে হইবে।

শ্রীমার পবিত্র জীবনের আদর্শখানি সম্মুখে রাখিয়া আমরা বলিতে চাহি—কোন্ দেশ পতির প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শনের অনাবিল আদর্শ স্থাপন করিতে পারে?

যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিয়াছেন—স্বামী ভগবানের প্রেমে

উন্মাদ, তাঁহার দেহচেতনা নাই, শরীরভোগের স্পৃহা নাই, সেই মুহূর্ত্তে কোন অভাবনীয় অকল্পিত জগৎ হইতে দুর্জ্জয় শক্তি অবতরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় তদ্ভাবে গড়িয়া তুলিল, তিনি জীবনভোর স্বামীসম্ভোগবাসনায় আর কাতর হইলেন না।

আমাদের নারীজাতির সম্মুখে, তাঁহাদের স্বভাবজীবন-প্রবাহে যে অপার্থিব শিক্ষার বস্তু ভাসিয়া যায়—উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত জাতির চেতনার স্তর চঞ্চল বলিয়া, তাহা লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া দিবার মত অবস্থাও আমাদের ঘটে না। এই যে সম্মুখে দেবদম্পতি অমৃতময় জীবন যাপন করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন—আমাদের মধ্যে কয়জন ইহা তলাইয়া বুঝিল, ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিল? পতিত্বের মধ্যে সম্ভোগবৃত্তি না রাখিয়াই পত্নীর হৃদয়ে পরিপূর্ণ সুবর্ণঘট কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়, এ কৌশল কয়জন অনুসন্ধান করিল?

জাতিকে উন্নতির চরম সীমায় উঠাইতে হইলে, ভগবানের এই প্রত্যক্ষ দান আর আমাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

শ্রীমার জীবন অসাধারণ বলিয়া যদি মনে হয়, আমরা এইরূপ জীবনের অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি। কিন্তু জীবনের সবখানি মূল্য না দিলে আদর্শ বলিয়া কোন বস্তুকে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে; তাই এই বিষয়ে বিরত রহিতে হইল। আমরা দেখি—বাংলার সমাজে নারীজাতির মধ্যে এখনও নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, তপস্যার যে আগুন পবিত্র শিখা বিস্তার

করিয়া প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে জগতের পাপ ধ্বংস হইতে পারে। তাই আমাদের [illegible]কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নারীর তপস্যার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নিঃসন্ত থাকিতে পারি। কেবল বলি —উঠ মা! জাগ মা!! আবার একবার সিংহবাহিনি মহাশক্তি! পশুশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া দেবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর।

ব্রতধারিণী

হিন্দুসমাজে বিধবার উপর যে কঠোর বিধিব্যবস্থার বিধান আছে, তাহা অজ্ঞানতার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা ও নির্য্যাতনের কারণ হইয়া থাকে ; পরন্তু বৈধব্যব্রত-পালনের নিয়ম স্বামীহীনা স্বাধ্বী পত্নী স্বয়ং বরণ করিয়া ব্রতধারিণী হয়, এ কথা বিকৃতরুচি বিদেশীর শিক্ষায় উন্মার্গচিত্ত নরনারী হয় তো জানিতে চাহেন না। তাই সমগ্র হিন্দু বিধবার দুঃখের কাহিনী বিকৃত করিয়া অনেকের মায়াকান্না দেখি।

বিদেশী বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া বলে—মৃত পতির গৃহে সে অন্যান্য পরিজনের দাসী হইয়া থাকে, সংসারে যাবতীয় কঠোর ও হীন কার্য্য তাহার দ্বারাই করান হয়, বিধবার শান্তি নাই, বিশ্রাম নাই। বিধবা একাহার গ্রহণ করে এবং জঘন্য আহার তাহাকে দেওয়া হয়, সে উপবাস করে, মাথার কেশ চাঁচিয়া ফেলে, তা' ছাড়া কোন শুভকর্ম্মে তাহাকে যোগ দান করিতে দেওয়া হয় না, নিতান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার সহিত তাহার নাম উল্লেখ করা হয়—বিধবার দুঃখের অন্ত নাই।

কথাগুলি সমাজের এক শ্রেণীর লোক শুনিলে লজ্জায় মাথা নত করিবে, সন্দেহ নাই। তথাকথিত পরদুঃখকাতর, আরাম-চেয়ারে উপবিষ্ট সমাজ-সংস্কারক এইরূপ স্পষ্টবাদিতার প্রশংসাও করিবেন; কিন্তু ইহার প্রতীকার করার শুভ ইচ্ছা যাহার নাই, তাহার এই পরচ্ছিদ্র দর্শন যে কত বড় অপরাধ তাহা বুঝাইয়া বলা দায়।

আমাদের দৃষ্টি আর আমাদের নাই, আমাদের চিন্তার ভঙ্গী একেবারেই বিপরীতমার্গী; আমরা যাহা দেখি, যাহা ভাবি, যে ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি ছকিয়া লই, আমাদের প্রকৃতি তদনুগত এমনই হইয়াছে, যে আমরা তাহা ছাড়া আর কিছু দেখি না, ভাবিতে পারি না, কার্য্য করিতে হইলেও ঠিক এই ছকেই পা দিয়া হাঁটি—শুধু ভারতের অমলিন সত্তার কাতরতা আজিও উপেক্ষা করিতে পারি না। আত্মরক্ষার প্রতি পদক্ষেপেই বেদনার সাড়া তুলিয়া কে যেন বলিতে থাকে,—ইহা ভারতীয় নয়—বাঁচিবে, কিন্তু ভারতের প্রাণ লইয়া নহে, সাবধান! তাইতো থমকিয়া দাঁড়াই। তখন একদল অতিষ্ঠ হইয়া গালি দেয়, দুঃখের ভানে চক্ষের সম্মুখে পতনের হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখাইয়া আবার উদ্বুদ্ধ করে—ঐ অভিনব নীতি অনুসরণে।

যখন দেখি—বত্রিশ লক্ষ জননী সূতিকাগারে কেবল জাতির অজ্ঞানতার জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, শূন্যের পর শূন্য বসাইয়া শিশুমৃত্যুর হার যখন বছরে বছরে বাড়িয়া উঠে, কোটী কোটী বিধবার পারিবারিক

নির্যাতন-কাহিনী চক্ষের সম্মুখে বীভৎস নৃত্য করে, বালবধূর উপর পিশাচ স্বামীর অকথ্য অত্যাচার যখন ইংরাজের হাসপাতালের রেকর্ডে কাল কাল অক্ষরে জাতির কলঙ্ক জগতে মসী ঢালিয়া দেয়, তখন কাতর হৃদয় লইয়া ইচ্ছা হয়, নূতনের চরণ ধরিয়া বলি—ওগো বাঁচাও। কুলকিনারা না পাইয়া পাশ্চাত্যের সবল হস্ত ধরিয়া বাঁচিতে সাধ যায়, কিন্তু আমাদের মত করিয়া কি তাহারা আমাদের বাঁচিতে দিবে?

অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? বালবিধবা কন্যাকে গৃহের এক পার্শ্বে স্থান দিয়া, পিতা অকাতরে কাম চরিতার্থ করিয়া চলে; শিক্ষা নাই, সাধনা নাই, যৌবন-জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাস বুকে চাপিয়া পতিহীনা যুবতী—সারা রাত্রি পারিবারিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারীপুরুষের যে রিরংসাবৃত্তির ঢেউ নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝে সে থাকে কেমন করিয়া?

ভাবি না, প্রতিকার করি না; সমাজব্যবস্থার দায়ে, দুহিতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূর দুর্ভাগ্যসংঘটনে মাথার সিঁদুর মুছিয়া, নিরাভরণার কঠোর বেশটুকু তাহাকে দিয়া প্রকৃতির সহিত অমানুষিক সংগ্রাম করিবার সব ভারই জ্ঞানহীনা অবলার উপর ছাড়িয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। অপরাধে খড়্গহস্ত—কিন্তু এই দুঃসহ জীবনপথে চলার পাথেয় না দিয়া, বৈধব্যব্রতপালনের দায় ঘাড়ে চাপান আমাদের যে ঘোরতর অবিচার, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

ভারতের ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখা কত দিন চলে! দেড়শত বৎসর দেহের উপর প্রভুত্ব করিয়া, রাজশক্তি জাতির মন অধিকার করিতে চায়; কাজেই আমাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আজ আর তাহাদের অগোচর নয়। হিন্দুজাতির অন্তঃপুর তো কেবল বাহিরের সহিত সম্পর্কবিহীন প্রাচীর দিয়া ঘেরা কোন স্থানবিশেষ নয়, আমাদের অন্তঃকরণের যথার্থ পরিচয় এইখানেই যে মিলে! খেলাঘর পাতিয়া যে বালিকা পুত্তলিকার সাহায্যে নারীপুরুষের ভবিষ্য জীবন-চিত্র আঁকিয়া চলে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের উপর ছিন্ন কানি পাতিয়া যুগলপুত্তলিকাস্থাপনে বাসরসজ্জার স্বপ্নে যে হিয়া গড়িয়া তুলে, বল দেখি—অকস্মাৎ এই আবাল্যরচিত স্বভাব-জীবন যখন পতিবিয়োগ-বজ্রে ছারখার হইয়া যায়, সে কোন্ শিক্ষা-সাধনার বলে আত্মস্থ হইয়া, সারা জীবন সচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিবে? হিন্দু বিধবার জীবন-যন্ত্রণার তপ্তশ্বাস সমাজের ভিত্তি যে পুড়াইয়া ছাই করে, ইহা যে কোন বিদেশী সহজেই লক্ষ্য করিতে পারে। হিন্দু নারীর ভবিষ্য জীবনে যে কোন মুহূর্ত্তে ঘোরতর দুর্দ্দিনসমাগমের সম্ভাবনা আছে, তাহা জানিয়াও আমরা এই মহা অকল্যাণ-চিন্তা স্মরণেও শিহরিয়া উঠি—এই অবস্থায় নারীর কর্ত্তব্য অনূঢ়া দুহিতাকে শিক্ষা দিব কেমন করিয়া?

ভারতের সভ্যতা বজায় রাখিয়া, পাশ্চাত্যের জীবন-নীতির অনুসরণপ্রবৃত্তি এই অবস্থায় খুব স্বাভাবিক।

চাক্ষুষ দুরবস্থার যে সব লক্ষণ আমরা দেখি, তাহাতে শীঘ্র বাঁচিবার উপায় অন্বেষণ করার দিকেই চিত্ত আকুল হয়, পথ সুগম বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আইনের খসড়া পর্য্যন্ত গড়িয়া ফেলি, জাতীয়সত্তার মরণ হয় নাই বলিয়াই জাতীয়ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার কথা উচ্চারণ করি, চলিতে চাহি পাশ্চাত্যের নির্দ্দেশে ; পরন্তু দেশের এই দুরবস্থার প্রতীকার যে পন্থায় সুসিদ্ধ হইবে, সে পথ খুবই দুর্গম, সে পথে চলার সামর্থ্যবীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছি বলিয়াই মনে হয়, বুঝি আমরা বাঁচিবার ছলনায় মরণকেই আলিঙ্গন দিব।

আশা—সত্তার চেতনা মলিন হয় নাই ; কিন্তু নৈরাশ্য —আমাদের জীবনযন্ত্র পাশ্চাত্যপ্রভাবে ক্রমেই বিকৃত ও দূষিত হইয়া পড়িতেছে। কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইলেই, ভারতীয় প্রথাটি ধরিতে পারি না ; পাশ্চাত্যের অনুকরণ বড় হইয়া উঠে। কাজেই এই ঘোর বিপর্য্যয় হইতে মুক্তি আমাদের দিবে কে ?

পুরুষের শিক্ষা ভারতীয় ভাব হইতে যে ক্রমেই দূরে গিয়া পড়িতেছে, তাহা বুঝিতেছি ; নারীর শিক্ষাও যাহা কিছু হয় বা হইবে, তাহাও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে না। শিক্ষার ভিতর দিয়াই জীবন গড়িয়া উঠে, সেই শিক্ষার ছাঁচ যদি নির্দ্দোষ না হয়, গঠন যে বিকৃত হইবেই।

জোর করিয়া বৈধব্য উঠাইলেও, আমরা তো ব্যাভিচার হইতে, নারীনির্য্যাতন হইতে মুক্তি পাইব না। বিধবা অসহায়া রক্ষকহীনা—এই হেতু তাহার সামান্য দোষ বড়

করিয়া চক্ষে পড়ে ; কিন্তু সধবা, বিধবা, কুমারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা অত্যাচারের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যে দেশে প্রতি বৎসরে অন্যূন এককোটী লোক যমযাত্রা করে, সে জাতির ভদ্রস্থতা কোথা ? আত্মসম্মান রক্ষা করা যায় কি ? বিপদের দিনে দুর্দ্দশা যে অন্তহীন হয়, সে দৃশ্য দেখাইয়া জাতির মৌলিক সভ্যতা খর্ব্ব করার প্রয়াস যে ঘোরতর হটকারিতা—অকথ্য কাপুরুষতা। এই অবস্থা যদি আমেরিকার হইত, ইংলণ্ডের হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা কেবল পেটের জ্বালায় পত্নীপুত্রকে বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিত ; ভারতের অমর সভ্যতা সে দায় হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছে। বিধবার আদর্শ—এই দুরবস্থার দিনে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতির মধ্যেও বৈধব্যের আচরণে স্বেচ্ছায় পুণ্যব্রতের ন্যায় পালিত হয়। আমরা নারীবৈধব্যের কয়েকটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চাই —কুসুমে কীট প্রবেশ করার মত নিষ্ঠুর বৈধব্যব্রতের শিক্ষা সুকুমারী বালিকার অন্তরে গাঁথিয়া না দিয়া, বিধবার আদর্শজীবন পুণ্য প্রদীপের মত সমাজের স্তরে স্তরে যে ভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, স্বামীহীনা নারীর পক্ষে সে মহা-দৃষ্টান্তের অনুসরণ স্বভাবের অনিবার্য্য আবর্ত্তের মধ্যেও সহজ ও সম্ভব হওয়া দুঃসাধ্য নহে। সনাতন সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু বিধানের মর্ম্ম ভুলিয়াছি বলিয়াই, সমুদ্রবক্ষে একবিন্দু বারির অভাবে বুকের ছাতি আমাদের ফাটিয়া যায় !

রাণী রাসমণি

ঐ দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ—শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সাধনার মিলনে ধর্ম্মসমন্বয় সাধন করিয়াছে। এইখানেই নবযুগের ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া জাতির জীবনে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছেন; পতিতকে অন্ধকে উঠাইয়াছেন, পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই দক্ষিণেশ্বরের ধূলিমাটী অঙ্গে মাখিয়া অসংখ্য নরনারী নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এই অতুলনীয় কীর্ত্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী একজন বিধবা—তেজস্বিনী তপস্বিনী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণি। আমরা তাঁর পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তন করিব।

হিন্দুসমাজে মাহিষ্য জাতির স্থান তেমন উচ্চ নয়—শিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি অভিজাতশ্রেণীর মধ্য হইতে এই রমণীরত্ন আবির্ভূতা হন নাই, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী হালিসহরের সন্নিকটবর্ত্তী কোণা নামক একটী নগণ্য পল্লীতে হরেকৃষ্ণ দাস নামক সামান্য লোকের ঔরসে ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হইলে, রাণী রাসমণিকে একাদশ বৎসর বয়সে পাত্রস্থা করা হয়। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা একেবারে নাকচ করার জন্য যাঁহারা উদ্যত, তাঁহারা

এই মহীয়সী নারীর জীবন অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন—একজন অশিক্ষিতা বালিকা অল্প বয়স হইতে স্বামীর সংসারে একান্ত ভাবে বাস করার সুযোগ পাইয়া, ধীরে ধীরে একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের বিস্তৃত বিষয়কার্য্য এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে নিতান্ত দুর্দ্দিন আসিলেও তিনি বিচলিত হন নাই, অতি যোগ্যতার সহিত স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারের সুপরিচালনায় নিজেও যশস্বিনী হইয়াছিলেন, পতিকুলের গৌরববৃদ্ধিও করিয়াছিলেন।

বাল্যবিবাহ অপেক্ষা যোগ্য বয়সে পুত্রকন্যার বিবাহ হওয়াই সঙ্গত—অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তির যথারীতি পুষ্টিবিধানের জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কন্যাকে যদি পতিগৃহের কর্ত্রী হইতে হয়, সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান যদি ইহাই নির্ণীত হয়, তাহা হইলে অল্পবয়সে কন্যাকে পাত্রস্থ করা অধিকতর শ্রেয়ঃ বলিয়াই মনে হয়। কেন না, হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণের সহিত যে বস্তুকে আপনার করিয়া লওয়া হয়, তাহা ভবিষ্যতে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কৈশোরেই জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়; এই সময়ে শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া যে আদর্শ গড়িয়া উঠে, স্বভাবতঃ কি পুরুষ, কি নারী, উভয়ের জীবনই তদনুযায়ী গড়িয়া উঠে। নারী যদি পুরুষের ধর্ম্মপত্নী হয়, তাহা হইলে পুরুষের আদর্শই নারীর গ্রহণীয়। অতএব কৈশোরকালের পূর্ব্বেই পুরুষের সহচরী

হইলে, পতির সহিত পত্নী ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আদর্শে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারে; আর ঐরূপ হইলে ঐকান্তিক মমতাগুণে, পতির মর্য্যাদা-রক্ষায় পত্নী কোন কারণে কুণ্ঠিতা হয় না। বয়স্থা শিক্ষিতা পাত্রী বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্ণয় করে। অনেক ক্ষেত্রে দুরবস্থার দিনে এইরূপ পত্নীকে পতির ভিটা-ছাড়া হইতে হয়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—যে একনিষ্ঠ মমতায় বালিকা পত্নী পতিগৃহের প্রতি দ্রব্যটী আপনার করিয়া লয়, বয়সাধিক্য বশতঃ পরকে আপন করার যে সাধনা, এইরূপ অবস্থায় তাহার সে সুযোগ মিলে না; কাজেই হৃদয়ের মধুর সম্পর্ক হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। তবে বালিকা পত্নী গ্রহণ করায় গুণের অপেক্ষা দোষের ভাগ যে অল্প, তাহা নহে; কিন্তু সে দোষ অনায়াসে দূর করা যায়, যদি বিবাহিতা বধূকে যথারীতি শিক্ষিতা হওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়। বিবাহ হইলেই যে অবগুণ্ঠনে একেবারে মুক্তির জগৎ হইতে তাহাকে অন্তরীণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

রাণী রাসমণির জীবনে দেখি—তিনি পতিহীনা হইয়া, নিদারুণ শোকবজ্র হৃদয় পাতিয়া সহিলেন বটে; কিন্তু স্বামীর গৌরব যাহাতে কোন কারণে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার জন্য ব্রত-ধারিণী রূপেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন। হিন্দু-বিধবার আদর্শ—জীবনধারণ ব্যতীত শারীরিক ভোগ হইতে সতত সতর্ক থাকা। এইজন্যই হিন্দুবিধবা একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে, মৃত্তিকাশয়নে নিশি যাপন করে,

বিচিত্র বসন-ভূষণ বর্জ্জন করিয়া কেবল লজ্জানিবারণের জন্য সাদাসিধা এক বস্ত্র পরিধান করে। বিধবার এইরূপ তপস্যা স্বেচ্ছাকৃত। বিষয়মত্ত বিভ্রান্ত চিত্তকে সংযত রাখিয়া স্বামীগত করার এই অভ্রান্ত নীতি সমাজবিধিরূপে সকল বিধবার উপর শাসনের মত জাঁকিয়া বসিয়াছে, জীবন-সাধনার নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্ম প্রচার করার চারণব্রতী আচার্য্যসঙ্ঘ-গঠন ঘটিয়া উঠে নাই; কাজেই নীতি আছে, নীতির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য তাহার অবধারণে অসমর্থ হইয়া আমাদের দেশের কোন কোন বিধবা দুর্ভাগ্যের সহিত সমাজের এই নিষ্ঠুর আচরণ অবিচার বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, আর ইহারই ধুঁয়া ধরিয়া পাশ্চাত্যপ্রভাবমুগ্ধ, তথাকথিত নেতৃস্থানীয় অনেকেই একান্ত পরের মত, হিন্দু-সমাজের এই বিধি অমানুষিক অত্যাচার বলিয়া ঘোষণা করেন। অহিন্দু বিদেশী ইহাদের মুখে ঝাল খাইয়া বিষয়টী এমনই কদাকার মূর্ত্তিতে অতিরঞ্জিত করেন, যাহা দেখিয়া জগৎ হাসে আর ভারতের এই সনাতন জীবননীতির কুৎসা করিয়া আমাদের অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গালি দেয়।

রাণী স্বামীহীনা হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ঘোরতর সংযম-সাধনা ও একনিষ্ঠ তপস্যার সুফল বাঙ্গালী কোন যুগে অস্বীকার করিবে না। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে দেববিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া দীর্ঘকাল স্ফটিকের মালা ঘুরাইয়া জপ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠে হীরকহার আর দেখা

যায় নাই, মোটা তুলসীর মালা কণ্ঠে দুলিত। অতি সতর্ক হইয়া, বিষয়কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি বংশের মুখ রক্ষা করিতেন।

স্বামীর মৃত্যুকালে রাণীর হস্তে ৬৮ লক্ষ টাকা নগদ ছিল; তদ্ব্যতীত বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শেয়ার ৮ লক্ষ টাকা, ২ লক্ষ টাকা প্রিন্সকে ঋণ ও একলক্ষ টাকা ডেভিড্‌সন এণ্ড কোম্পানীর নিকট ঋণস্বরূপ গচ্ছিত ছিল। এই বিপুল সম্পত্তির একটী কড়িও তিনি বৃথা ব্যয় করেন নাই। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, আশ্রিতকে কোন দিন উপেক্ষা করেন নাই, সত্যরক্ষায় কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, প্রত্যুপকারে সতত প্রস্তুত থাকিতেন।

১২৪৩ সালে তাঁহার স্বামীবিয়োগ হয়। মৃত পতির পারলৌকিক ক্রিয়ায় দেশের কেহ বস্ত্রহীন ছিল না। দীন, দরিদ্র, কাঙাল ভোজনে দানে পরিতৃপ্ত হৃদয় লইয়া দুই হাত তুলিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন সম্মান সৌজন্যে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসায় কলিকাতা মুখরিত করিয়াছিল।

রাণী দরিদ্রের কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদে আসিয়া, যোগ্য শিক্ষা ও আচার আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি দস্যুর নিকটও কথার মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই। কলিকাতা আসিবার কালে, চন্দননগরের দক্ষিণ প্রান্তে গুরুটীর জঙ্গলে একদল দস্যু তাঁহার তরণী আক্রমণ করে। রমণীর দ্বারবান্‌গণ দস্যুদিগকে পরাভূত করিবার উদ্যোগ করিলে

তাহারা মিনতি পূর্ব্বক বলে—"রাণী-মা, আমরা অর্থ চাই, অনর্থক রক্তপাত করিতে আসি নাই।" রাণী তখন তাঁহার নিকট যাহা ছিল, তাহা দিয়া বলিলেন—"তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও, আমরা কল্যই তোমাদের বারজনকে বার হাজার টাকা পাঠাইয়া দিব।" রাণী কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন।

দানে মুক্তহস্ত, সত্যরক্ষা, দেবদ্বিজে ভক্তি, ধর্ম্মে বিশুদ্ধ চিত্ত—এই সদ্গুণগুলিই তাঁহার অসাধারণ চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল না; নারীর তেজস্বিতা, আশ্রিত-বাৎসল্য, নির্ভীকতা—এই গুণেও রাণী দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

রাণীর স্বামী রাজচন্দ্র সত্যব্রতী, দানশীল, পরোপকারী ছিলেন। পত্নী স্বামীর অনুরূপ চরিত্রের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। নারীর এই শিক্ষা কিরূপ গৌরবের, তাহা তাঁর জীবন-দৃষ্টান্তে উপলব্ধি করা যায়।

রাজচন্দ্র বাবুর পরহিতৈষিণার চিহ্ন কলিকাতার আহেরীটোলার স্নান-ঘাট, নিমতলার ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের গৃহ, জানবাজার বাড়ী হইতে ইডেনগার্ডেন পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে নহর, চানকের তালপুকুর, বাবুর ঘাট প্রভৃতি সাক্ষ্য দিতেছে।

এই বাবুর ঘাট সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রাণীর পণ-রক্ষার জিদ্ কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাই। বাৎসরিক দুর্গোৎসব অতি সমারোহের সহিত তিনি সম্পন্ন করিতেন।

নবপত্রিকা-স্নান তুমুলবাদ্যধ্বনি সহ সম্পন্ন হইত। পথিপার্শ্বে কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণীকে আইনতঃ ইহা হইতে নিবৃত্তি হইতে বলায়, তিনি অধিকতর উৎসাহ-সহকারে তৎপর দিন বহুসংখ্যক বাদ্যকর লইয়া শোভাযাত্রা করিলেন। মকদ্দমা আরম্ভ হইল। রাণী বলিলেন "এ রাস্তা আমার স্বামী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতএব আমার রাস্তায় আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, সরকার যদি বাধা দেন, তবে রাস্তা নষ্ট করিয়া দিব।"

বিচারে রাণী পরাস্ত হইলেন। তাঁহার ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া জানবাজার হইতে বাবুর ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লম্বা করিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিলেন। যাতায়াতের পথ বন্ধ হইল, সরকার বাহাদুর ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীকে শীঘ্র বাধা উঠাইয়া লইতে বলিলেন। রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "রাস্তা আমার —আমি যাহা ইচ্ছা করিব, তবে সরকার যদি ইহা প্রয়োজন বোধ করেন, যথামূল্যে খরিদ করিতে পারেন।"

তাঁহার এইরূপ অস্বাভাবিক জেদ দেখিয়া সরকার পক্ষ প্রমাদ গণিল। বার বার কড়া হুকুমেও যখন ফল হইল না, তখন অনুরোধ করা হইল। তারপর রাণীর অর্থদণ্ড নাকচ করিয়া—পূজা পার্ব্বণে শোভাযাত্রা করিতে হইলে, কোম্পানী বাহাদুরের নিকট পাশ লইলেই কোন গোল হইবে না, এই সর্ত্তে রাণী বেড়া খুলিয়া লইলেন। একজন বিধবা বঙ্গরমণীর

এইরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া, কলিকাতার লোক 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

আর একবার গঙ্গায় ধীবরগণের জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরার উপর গবর্ণমেণ্ট কর ধার্য্য করেন। দরিদ্র মৎস্যজীবিগণ ইহাতে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া কলিকাতার নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তির নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে; কিন্তু কেহই সদুপায় করিতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা রাণীর শরণাগত হয়। রাণী অতি বিচক্ষণতার সহিত এই বিষয় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমরা যাও, ব্যবস্থা হইবে।" তারপর তিনি নিজের কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া ঘুসুরি হইতে মেটীয়াবরুজ পর্য্যন্ত গঙ্গার মাছ ধরিতে গবর্ণমেণ্ট কত টাকা চাহেন, তাহা জানিতে আদেশ করেন। যখন শুনিলেন—দশ হাজার টাকা হইলেই গবর্ণমেণ্ট গঙ্গা জমা দিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া মেটিয়াবরুজের তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত গঙ্গা টানা জাল দিয়া ঘিরিয়া দিলেন ও মাঝে মাঝে বাঁশ বাঁধিয়া যাহাতে জাহাজ কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। রাণী বলিলেন—আমি ব্যবসা করিব, তাহার জন্য কোম্পানীকে টাকা দিয়াছি; আমার মাছ নষ্ট হইতে পারে, এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণীর নিকট পরাস্ত হইয়া, দশহাজার টাকা ফিরাইয়া

দিলেন। সেইদিন হইতে গঙ্গায় বিনা করেই দরিদ্র মৎস্য-জীবিরা জীবিকার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের ঘনকৃষ্ণ মেঘে কোম্পানীর রাজ্য ছাইয়া যায়। ইংরাজের রাজ্য বুঝি আর রক্ষা পায় না, এই আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্না রাণী ইংরাজের বুদ্ধি ও সমরকৌশলের মর্য্যাদা বুঝিতেন; তিনি অল্প মূল্যে বহু সহস্র কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিলেন। বিপ্লবদমনের পর, তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। এই সময়ে তাঁর অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

উচ্ছৃঙ্খল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকগণ পথিকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেছিল দেখিয়া রাণীর জামাতৃগণ দ্বারবান্‌-গণকে ইহা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করিবার জন্য আদেশ করেন। ইহার ফলে, গোরারা দল বাঁধিয়া রাণীর বাটী লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হয়। দ্বারবান্‌গণ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। গোরারা রাণীর ভবনে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি লুঠপাট করিল, দাসদাসীদের উপর অত্যাচার হইল; রাণী কিন্তু বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া একখানি মুক্ত কৃপাণ হস্তে অন্তঃপুরমধ্যস্থিত রঘুনাথ জীউর মন্দির-রক্ষায় স্থিরাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন তাঁহার সে ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া গোরারা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ

করিল। ইতিমধ্যে রাণীর জামাতা রামচন্দ্র খিড়কীদ্বার দিয়া বাহির হইয়া, গোরাদের অধিনায়ককে সঙ্গে আনিয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন! কোম্পানী বাহাদুর ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ অর্থদান করিতে চাহিলে, রাণী তাহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কৃতজ্ঞতা দেখাইতে কোম্পানী কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার বাড়ীতে গোরা পাহারার ব্যবস্থা করেন।

রাণী রাসমণি পল্লীক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও, বিষয়সম্পত্তির রক্ষার সহিত জনহিতকার্য্যে যেরূপ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই বঙ্গরমণী যদি রাজ্যেশ্বরী হইতেন, তবে বিশাল জনপদ সুশাসনে পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইত না। তিনি বর্ত্তমান কালের বিদুষী মহিলাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই; তবে সাংসারিক জীবনযাপনের মধ্যে যে মহাশিক্ষা প্রকৃতি নিরন্তর দান করেন, তিনি তাহা সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের সহিত উৎসবের আনন্দ একত্র করিয়া, তিনি সাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন। রাণীর রৌপ্যরথ দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। পুরীধামে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার যে হীরক-মুকুট দেখিয়া লোকের চক্ষু আজিও ঝলসিয়া যায়, ইহা রাণীর বিমল যশঃ-গরিমার জাগ্রত পরিচয়। আর দক্ষিণেশ্বর—জগতের অমর কীর্ত্তি—এই সৌভাগ্যবতী রমণীর

পবিত্র স্মৃতি চিরযুগ জগদ্বাসীর অন্তরে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

১২৬৭ সালের ৯ই ফাল্গুন রাণী রাসমণি পরলোকে যাত্রা করেন। বাংলার স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করার রাজবর্ত্ম মুক্ত, প্রশস্ত—বঙ্গবিধবার সম্মুখে ইহা বড় কম আশার কথা নহে।

মহারাণী শরৎসুন্দরী

বৈধব্যজীবনের আর একটী উজ্জ্বলতম আদর্শ—পুটিয়ার মহারাণী মাতা শরৎসুন্দরী। রাণী রাসমণির বৈধব্য বাঙ্গালীর সমাজে কোনরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; সমাজবিধানে নারী পুরুষের মধ্যে বয়সের বিসদৃশ পার্থক্য পূর্ব্ব হইতেই নারীর বৈধব্য সূচনা করে। সীমন্তে সিঁদুর না মুছিয়া যে নারী পরলোক যাত্রা করেন, হিন্দুসমাজের চক্ষে তাঁহাকে সৌভাগ্যবতী বলা হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা যে অকালমৃত্যু তাহা না বলিলেও চলে।

মাতা শরৎসুন্দরীর পূত চরিত্রে, বাল্যবিবাহ ও অকাল বৈধব্য—এই দুই প্রাচীন সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা স্বজাতীয় সমাজ-সংস্কারক ও বিদেশী ভারত-বন্ধুদের একবার এই পবিত্র হোমানলসদৃশ মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুটিয়া গ্রামে, ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভৈরবনাথ সান্যাল। শরৎসুন্দরীর মাতা—ধর্ম্মপরায়ণা ও পতির অনুরাগিণী ছিলেন। কন্যা মাতার আদর্শেই আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে পরিচয় তাঁর জীবনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

১২৬২ সালে মাতা শরৎসুন্দরীর বিবাহ হয়। পুঠিয়ার জমীদার কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের হস্তে তাঁহাকে সম্প্রদান করা হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল।

অতি শৈশবকাল হইতে স্বামীর সহিত একত্র থাকার সুবিধা হওয়ায়, জীবনবিকাশের প্রতি ভঙ্গীটীর সহিত স্বামীকে জড়াইয়া এক অপার্থিব, অনাবিল, অসঙ্কোচ সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। বাল্যবিবাহের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা এই নব বরবধূর জীবনলীলা যদি পর্য্যবেক্ষণ করার অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন—হিন্দু সমাজের সনাতন ব্যবস্থা যথাযথ পালন করার সাধ্য থাকিলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অচ্ছেদ্য নিত্য বন্ধনগ্রন্থী সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের প্রকৃত আস্বাদ উপভোগ করিয়া নারীজীবনও সার্থক হয়, স্বামীও পত্নীর শ্রদ্ধা ও আত্মদানে কৃতার্থ হইতে পারে। যে পুরুষ পত্নীর পরিপূর্ণ উৎসর্গ লাভে বঞ্চিত হয়, তার দাম্পত্যজীবন যে অর্থহীন এবং এইরূপ গার্হস্থ্যজীবন যে উভয়ের পক্ষেই দুঃসহ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিবেন।

বাল্যবিবাহ ব্যতীত, বয়স্কা পত্নীর সহিত পুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য মিলন যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলি না; তবে চেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষের সহিত কি পুরুষ, কি নারী উভয়েরু বৈশিষ্ট্য জন্মায়। হিন্দুর মিলনতত্ত্ব উভয় বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য নহে;

পরন্তু একের মধ্যে অপরের লয়। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া যে নারী গড়িয়া উঠে, তাহার পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা সহজ নয়। আমরা হিন্দু বিবাহের নিগূঢ় তত্ত্ব বৈদেশিক আদর্শ ও সভ্যতার চাপে বিস্মৃত হইতেছি; তাই আজ আর মিলনের মধ্যে যে সূক্ষ্মানুভূতির তারতম্য আছে তাহা অবধারণ করিতে পারি না—জীবন সফল হয় না বুঝি, কিন্তু কোথায় গলদ তাহা খুঁজিয়া পাই না। পুরুষ যদি নারীর উৎসর্গ না পায়, তবে তাহার জীবনে দেবত্বের বিকাশ হয় না। জীবনের আদর্শ—ভাগবত জীবন লাভ করা; আত্মসমর্পণের মন্ত্রেই ইহা সিদ্ধ হয়। ভারতের হিন্দু সমাজজীবন ভাগবত-সিদ্ধ করার জন্যই জীবনধারণের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিল; ভোগের কৃমি হইতে চাহে নাই। আমাদের সে শিক্ষা নাই, সাধনা নাই। এখন যাহা কিছু করিতে চাই পরানুকরণের দায়ে; কাজেই বাল্যবিবাহের মধ্যে সাধনার অনুকূল অবস্থার সন্ধান আর পাই না। কার্য্যকারণনির্ণয়ের স্থূল দৃষ্টিই এক্ষণে আমাদের নিয়ামক যন্ত্র। বয়স্থা শিক্ষিতা পত্নী জীবন-সঙ্গিনী হইলে ঝঞ্ঝাট কম হইবে, জগতের কাজে হয়তো যোগ্য সহকারিণী হইবে, দেখিতে শুনিতে সব দিক্ দিয়াই ভাল হইবে; কিন্তু সে যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি ত্যাগ করিয়া, তোমার সর্ব্ব কার্য্যে অনুসরণ করিয়া তোমায় পরিপূর্ণ করিবে? ইহা যে একেবারে সম্ভব নয়, তাহা নহে। অস্ফুটচেতনা বালিকা-বধূর উৎসর্গও কার্য্যকরী নয়; তবে সেখানে চেতনার

উন্মেষের সহিত স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়া সহজ বলিয়াই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ভারতের হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহাই একমাত্র সমাজবিধি বলিয়াও তাঁহারা কোথাও জিদ করেন নাই—বাল্য-বিবাহের সহিত পরিণত বয়সে নারী পুরুষের পরিণয়কাহিনী ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। বাল্য-বিবাহের মধ্যে দোষের ভাগ অধিক শিক্ষার অভাবে, সমাজশাসন শিথিল বলিয়া। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিয়া বলেন ঃ—"The Indian ideal of marriage is a flower of the sublimated spirit."

এই এক বৃন্তে অনাঘ্রাত কুসুমের মত, শরৎসুন্দরী তাঁহার দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক পতির সহিত জীবন্-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পুটিয়ার রাজপ্রাসাদ আলো করিলেন। বালিকা-বধু পরিজনবর্গের কৌতুকের বস্তু ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলেই নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেন। স্বামীকে তিনি নিঃসঙ্কোচে "লালপাত্র" বলিয়া আহ্বান করিতেন। পত্নীর অভিমান হইলে কুমার আদর করিতেন, কেহ বিরক্ত করিলে তাহাদের তিরস্কার করিতেন। প্রেমের অনবদ্য ফুল দুটী ভগবানের চরণাভিসারে সে দিন বড় উচ্ছ্বাসে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল।

হিন্দু সমাজের সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস জোর করিয়া মানুষের মনে দৃঢ় রাখার ব্যবস্থা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পরিণাম কি ভীষণ হয়, তাহা আমাদের দিকে লক্ষ্য দিলেই বুঝা যায়। বিশ্বাসের মূলে কি যুক্তি আছে, তাহার

আলোচনা চাই, অনুশীলন চাই; ইহার অভাবেই আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। বাল্য-বিবাহের প্রচলন থাকার ফলেই যে হিন্দু সমাজের অধঃপতন, ইহা সবখানি সত্য নয়। মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন:—"The chief objection to early marriage is that it weakens the health of the girl and her children. But this objection is not very convincing for the following reason. The age of marriage is now rising amongst the Hindus, but the race is becoming weaker." অর্থাৎ বাল্যবিবাহে আপত্তি, আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির চরমে গিয়া পৌঁছিতেছে, এইজন্য। পরন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেমনা বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে পরিণত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা হওয়ার ফলেও জাতি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যখন আমাদের স্বাস্থ্য ছিল, সৌভাগ্য ছিল, সম্পদ্ ছিল, তখন মহাত্মা বলেন:—"Early marriage was then more in vogue."

আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুশীলন-সাপেক্ষ না হওয়ায় অন্তরে শক্তিহীন হইয়াছি; তাহারই ফলে শারীরিক দুর্দ্দশার চরম চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়ায়, চরিত্র দৃঢ় নয়; এই অবস্থায় পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা অভিভূত হই। কুমার যোগেন্দ্র নারায়ণের চরিত্রেও ইহার সামান্য আভাস পরিলক্ষিত হয়।

কুমার পিতৃহীন ছিলেন। তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে ছিল। তিনি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া যখন তিনি পুটিয়ায় ফিরিলেন, তখন তাঁর হাব ভাব হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতিনীতিবর্জ্জিত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগবশতঃ তিনি স্বীয় মতানুযায়ী পত্নীকে গড়িয়া লইতে যত্নবান্ হইলেন।

স্বামীর ইচ্ছামত কোন্ পত্নী না নিজেকে গড়িয়া লইতে চাহে ? কিন্তু ব্রাহ্মণপ্রধান পুটিয়ার সমাজক্রোড়ে আবাল্য-পালিত শরৎসুন্দরী স্বামীর সকল ইচ্ছা পূরণ করার পথে পদে পদে বাধা অনুভব করিলেন। তবুও তিনি ছয় মাসের মধ্যে একপ্রকার লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। স্বামীর সহিত প্রকাশ্যে মিলামিশা করিতে অনুরুদ্ধ হইলে লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিত। কুমার পত্নীকে সর্ব্ববিষয়েই আধুনিক ভাবে দেখিতে চাহিতেন। রাণীমাতা স্বামীর ইচ্ছাপূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; কিন্তু এক বিষয়ে একদিন তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা স্বাধ্বী ধর্ম্মপত্নীর যোগ্য ব্যবহার—পুরুষের প্রকৃতি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইলে, সহধর্ম্মিণী স্বীয় দিব্য প্রকৃতির দ্যোতনায় এই অধ্যাত্ম বল প্রদর্শন করিয়াই স্বামীকে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ করিতে পারে।

কুমারের খাদ্যাখাদ্যবিচার ছিল না; তিনি একদিন ধরিয়া বসিলেন—তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট রাণীকে খাইতে

হইবে। যে সকল খাদ্য অখাদ্য বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় সংস্কার, তাহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন, অথচ স্বামীর উচ্ছিষ্ট আদিষ্ট হইয়াও যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁর স্বামীর প্রতি যে একনিষ্ঠা শ্রদ্ধা তাহা যে ক্ষুণ্ণ হয়; তখন সাধ্বী প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে উত্তর করিলেন—"আপনার ভুক্তাবশিষ্ট আমি খাইব, কিন্তু আমার সাক্ষাতে এই সকল দ্রব্য রন্ধন করিতে হইবে, আমি বাহিরের বস্তু খাইব না।"

তাঁর এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, মূর্ত্তি প্রস্তরকঠিন হইল; কুমার পত্নীর এই সঙ্কল্প-ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। স্বামীর আদেশ অলঙ্ঘ্য; কিন্তু মহারাণীর মুখ দিয়া সে দিন যে বাণী বহির্গত হইয়াছিল, তাহা আপনার 'ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করার জিদ্ নহে। পত্নীর আত্মদান—কেবল দেহ নয়, মন নয়, ধর্ম্ম বলি দিয়া নিঃস্ব হইতে হইবে, নতুবা স্বামীর পূর্ণাঙ্গ জীবন কখনও সার্থক হইতে পারে না।

যে দেবতার পূজা করিব, সে দেবতার ভোগানুষ্ঠানের আয়োজন তো আমার মন্দিরেই হইবে; তাই তিনি ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য খাইতে দ্বিধা করেন নাই। যাহা নিবেদন করিবেন, তাহা নিজের হাতেই করিবেন, নিজেই দেবতার সম্মুখে ধরিবেন—পূজার এই নিষ্ঠাপালনের অধিকার না থাকিলে দেবতার যে ভোগ হয় না, ভক্তের অবদান না পাইলে দেবত্ব জাগে কি? কুমারের যদি সে চৈতন্য জাগিত, 'হিন্দু স্বামী নারীর ধর্ম্মসাধনার প্রতীক-স্বরূপ যদি

আত্মপ্রতিষ্ঠা পাইত, বোধ হয় নারীর এই বৈধব্যমূর্ত্তি, তপস্বিনীর বেশ হিন্দু সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন হইত। এই কঠোর ত্যাগ ও সংযম পুরুষকে দেবতা করারই অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু সমাজের বিধবা জাতির গ্লানি নহে, তপোমূর্ত্তি—এ কথা আজ বুঝাইব কাহাকে?

১২৬৭ সালে কুমার স্বহস্তে জমীদারীর ভার গ্রহণ করিলেন। ১২৬৯ সালের বৈশাখ মাসে মহারাণীর মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তিনি চির-বিদায় লইলেন। বল দেখি, এই অল্প বয়সের মধ্যে কোন দেশে, কোন নারী পতির নশ্বর দেহত্যাগ হইলে, তার হৃদয়ের মণিকোটায় তাঁর চিন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, দীর্ঘ জীবন তপস্বিনীর মত দেবতার আরাধনায় অবহেলে দিন যাপন করিতে পারে? ভারত যদি কোন দিন আবার মাথা উঠায়, তবে ভবিষ্য জাতির মেরুদণ্ডে এই সব সতী রমণীর পুঞ্জীকৃত তপস্যাই সঞ্চিত থাকিবে।

পাশ্চাত্য দেশের নারী সর্ব্বাগ্রে স্থূল জীবনের সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহাদের হিতকথা পার্থিব সুখ সৌকর্য্যের উদ্দেশ্যেই—আমাদের কাণে তাহা যেন বিষ ঢালিয়া দেয়। তাই রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়েল্‌স সাহেব পত্নীসহ পুটিয়ার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরীর শুভ্র জ্যোৎস্নার মত পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, স্নেহ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন, "রাণী, আপনার বয়স তো অধিক নয়, বিবাহ করিতে

দোষ কি ?" কি প্রগল্‌ভতা ! হা বিধাতঃ, মত্ত হস্তীকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়া মূষিকের পদপ্রহারের মত এই নির্য্যাতন—সত্যই যে অসহ্য ! এই জন্যই বলি, ওরে হতভাগ্য জাতি—হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত হৃদয়ে একবার ভারতের আদর্শপ্রচারের জন্য তোরা ভায়ে ভায়ে এক হ', তোদের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি—জগতে আশার সঞ্চার করুক !

সতী নারীর বুকে এই সদুপদেশ কি নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাত ! হিন্দুর প্রাণ ভিন্ন তাহা অন্য কোথাও বাজিবে না। কিন্তু রাণী প্রশান্তচিত্তে এই পাশ্চাত্য মহিলার অজ্ঞতা উপেক্ষা করিয়া, সহাস্যে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে হিন্দু-বিধবা, বিবাহের চিন্তাতেও যে আমাদের পাপ হয় !" তাঁর কণ্ঠে এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক উত্তর শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

রাণী যখন বিধবা হইলেন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু স্বামীবিয়োগে তিনি কাতর হইলেন না—ছয় বৎসর হইতে এই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যত কথা, যত খেলা, যত ভাব, সব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া লইলেন, এই ব্যথার স্মৃতি দিয়া তিনি জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইলেন। তাঁর কষিতকাঞ্চনবর্ণ অঙ্গে মোটা গড়া এক টুক্‌রা থান পরিধেয় হইল। সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশভার ছাঁটিয়া তিনি স্বীয় লাবণ্যরাশি সংহৃত করিলেন ; জঠরাগ্নিনির্ব্বাপনের জন্য একমুষ্টি হবিষ্যান্ন গ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দেবতার নামে উৎসর্গ করিলেন,

ধাতুপাত্র ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেন, কদলীপত্র তাঁর ভোজন-পাত্র হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী চিরসন্ন্যাসিনী সাজিলেন, মৃত্তিকাতল তাঁর শয্যাস্থল হইল। কি গ্রীষ্ম, কি শীত—প্রকৃতির সকল অত্যাচার সহিয়া তিনি নির্দ্বন্দ্ব হইলেন ; আর দেশের যত অনাথা সদাচার-পরায়ণা বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, নিজের পার্শ্বে স্থান দিলেন। তাঁর তপস্যার মন্দিরে অসংখ্য বিধবার তপোমূর্ত্তি চন্দ্রবেষ্টনকারিণী নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা পাইত। এ দৃশ্য দেখি নাই ; কল্পনায় যে শক্তি, যে বীর্য্য অনুভব করি, তাহাতে মনে হয়, এ দেশ—হে দেবী, তোমাদের তপোবলেই আবার উঠিবে, আবার জাগিবে, আবার ভারত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া জগৎ শাসন করিবে !

রাণীর সম্মুখে যে দেববিগ্রহ শোভা পাইত, তিনি তাহার দিকে চাহিতে পারিতেন না—যেন অভিমানে দু কুল ভাসিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয় অবিরল অশ্রুরূপে বক্ষ ভাসাইয়া দিত। ভাষা মূক—বেদনার মাঝে, বিরহের মাঝে এই তপস্যায় যে স্বর্গের আনন্দ, তাহা বুঝি বুঝান যায় না। থরে থরে নৈবেদ্য রচনা করিয়া তিনি দেবতার অর্চ্চনা করিতেন, এই অপ্রাকৃত আনন্দের মাঝে আত্মহারা তপস্বিনী কত দীর্ঘ সময় কাটাইয়া দিতেন ; তারপর তাঁর মুখে চোখে বিজয়শ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য লইয়া ফুটিয়া উঠিত—নিবিড় সান্ত্বনায়, স্থির প্রশান্ত চিত্তে, খাদ্য-সামগ্রী অতিথিদের বিতরণ করিতে পাঠাইতেন। এই ধ্যানমগ্না নারীর কিছুতে ধৈর্য্যভঙ্গ হইত

না। 'পারিবারিক অসংখ্য ঘটনার মাঝে কখনও তিনি বিচলিতচিত্ত হন নাই। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করায় লাভ নাই। দেখাইতে চাই—হিন্দুবিধবার তপোমূর্ত্তি; আর দেখিয়া ধন্য হও, জীবন শুধু সুবিধালাভের ক্ষেত্র নয়। এই স্বর্গীয় বিমল আনন্দের এক কণা যদি আস্বাদ করিতে, তবে বুঝিতে—অনিবার্য্য মৃত্যুর দংশনে পতিবিয়োগ হইলে, সাধ্বী কেন, কি অপার্থিব অমৃত আস্বাদ করিয়া, নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যমূর্ত্তি ধরিয়া থাকিতে চাহে; আর কি জন্য, এই আদর্শের উজ্জ্বল সঙ্কেতে, অজ্ঞজনও মুগ্ধ হইয়া ইহার অনুসরণ করিতে চায়। যদি হিন্দুসমাজের প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক বিধবাই দেবীর আসনে বসিয়া সমাজপ্রাণে বিমল সৌরভ বিকীর্ণ করিত।

জীবন নিঃস্বার্থ সত্যপুত হইলে, কি ঔদার্য্য ও মহত্ত্বগুণে মানুষের হৃদয় অলঙ্কৃত হয়, তাহা রাণীর জীবনাদর্শে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর নিকট ধর্ম্মবিরোধের কোন গণ্ডগোল ছিল না; তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দির-নির্ম্মাণেও যেমন মুক্তহস্ত ছিলেন, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা, ইস্লামের মস্জিদ, হিন্দুর মন্দিরগঠনেও তেমনি অকাতরে ধন বিতরণ করিতেন। আজ রাষ্ট্রসাধক জাতিযজ্ঞের পুরোহিতবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানবিরোধের মূল কারণ যে গো-হত্যা তাহা লইয়া ব্যতিব্যস্ত; আর রাণী নিঃসঙ্কোচে ইহার ব্যবস্থা করিয়া মুসলমান সমাজেরও পূজ্যা হইয়াছিলেন। বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা—হবিষ্যান্ন যাঁহার আহার, দ্বিজ গো

যাঁর পূজ্য পদার্থ—তিনি অনায়াসেই তাঁর জমীদারীতে এক মুসলমান গো-কোর্ব্বানি করায়, কর্ম্মচারিবৃন্দ যখন তাহাকে গুরুতর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অশেষ নির্য্যাতন করিতেছে, এই সংবাদ শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ নির্ভীক কণ্ঠেই বলিয়া পাঠাইলেন, "ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে যে গো-বধ করিয়াছে, তাহার উপর হিন্দুর এই অত্যাচার একান্তই অসহ্য। হিন্দুরা কি ধর্ম্মের নামে, ছাগ, মেষ, মহিষ বলি দেয় না? তবে মুসলমানের পক্ষে ইহার অন্যথা হওয়া অবিচার। অবিলম্বে ইহার প্রতীকার হউক, আর ভবিষ্যতে কোন মুসলমানকে ধর্ম্মকার্য্যে গো-বধে যেন বাধা দেওয়া না হয়।"

রাণী শরৎসুন্দরীর এই উক্তি যে কিরূপ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিলনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা না বলিলেও চলে।

রাণীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় তাঁর জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কলিকাতার উচ্চ বিচারালয়ে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র যেদিন প্রধান বিচারপতির আসন পাইলেন, রাণী আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেদিন দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর উন্নতি দেখিলে তাঁর আর আনন্দের অবধি থাকিত না। কত দরিদ্র ছাত্র তাঁর অনুগ্রহে যে যথারীতি শিক্ষা পাইয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; রাজসাহী কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

লর্ড রিপনের শাসনযুগে যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসননীতির প্রবর্ত্তন হয়, রাণী স্বয়ং সভা করিয়া ইহার সমর্থন

করিয়াছিলেন। তিনি দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উন্মুখ থাকিতেন, আত্মসাধনার মধ্যে দেশের সংবাদ রাখিতেও তিনি উদাসীন ছিলেন না; সংবাদপত্র যথারীতি পাঠ করিতেন, সংস্কৃত চর্চ্চা কিছু কিছু করিয়াছিলেন—তাঁর অকাতর দানে অনেক সংস্কৃত টোল আজিও নানাস্থানে বিদ্যমান আছে।

১৯২৩ সালের ২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর তপস্যার বলে ভবিষ্য বাঙ্গালী যে জীবনের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে আজ লক্ষ কণ্ঠে মাতৃবন্দনা করিয়া তাঁহার জয় দিবে, তাঁর পুণ্য মাতৃমূর্ত্তি বাঙ্গালীর পূজার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পাইবে। জাতির সুদিন আসিলে এ পুণ্যস্মৃতিরক্ষার আয়োজন বাঙ্গালী বিশেষ ভাবেই করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

রাণী ভবানী

একটী রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণ নয়ন—
শুক-তারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞানগর্ব্বিত বদন।”

বাংলার মহারাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, অর্দ্ধ বঙ্গ যাঁর সুশাসনে স্বাধীনতার জয়চ্ছত্র উড়াইয়াছিল, সেই মহাতেজস্বিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী নাটোরকুললক্ষ্মী রাণী ভবানীর নাম কাহারও নিকট অবিদিত নয়।

একদিকে আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করিয়া যখন স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছেন, অন্যদিকে উদীয়মান্ ইংরাজশক্তি বাংলার স্বাধীনতাহরণের জন্য যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, তখন এই উভয় শক্তির হস্ত হইতে স্বীয় বংশগৌরব ও রাজ্যরক্ষা কি অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয়, তাহা আর বলিবার নহে।

অত্যাচারী বাংলার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাংলার রাজন্যবর্গ যখন ইংরাজের হস্তে রাজ্যভার তুলিয়া

দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তখন রাণী ভবানীর সুযুক্তিপূর্ণ পরামর্শ অতি করুণ স্বরে আজিও আমাদের মর্ম্ম বিদীর্ণ করে। তাঁর স্বদেশ-স্বজাতিপ্রীতির সে বীর্য্যমন্ত্র সেদিন কেহই গ্রহণ করেন নাই। বাংলার ধনকুবের জগৎশেঠ, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার নেতৃবর্গ সমস্ত ভারতে ব্রিটিশের তেজোরাশি দেখিয়া, প্রলুব্ধচিত্তে মহারাষ্ট্র দস্যু ও নবাব সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাংলার রাজলক্ষ্মীকে ব্রিটিশের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাণী ভবানীর অভিমত অন্যরূপ ছিল। তিনি বাংলার জমীদার-বর্গকে একত্র করিয়া সমষ্টিশক্তি দ্বারা বাংলায় বাঙ্গালীর রাজ্য অটুট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঐক্যবল যদি জাতির থাকিবে, তবে এ দুর্দ্দশা আমাদের হইবে কেন? কবির কণ্ঠে, রাণী ভবানীর মর্ম্মবাণী আজিও বাংলার আকাশে বাতাসে ঝঙ্কার দিয়া উঠে—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতিসমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে; যেন পূর্ণশশী,
বঙ্গস্বাধীনতাধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
'হাসুক উজলি বঙ্গ।' এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনীভিতরে

নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।"

এই উক্তি একজন বঙ্গনারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল ; কবির কল্পনা হইলেও, রাণী ভবানীর চরিত্রে সে বিদ্যুদ্বীর্য্য তাঁর কার্য্যকলাপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাশালী জমীদার ছিলেন।

রাণী ভবানীরও বাল্যবিবাহ হইয়াছিল। পিতা আত্মারাম চৌধুরী অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করিয়াছিলেন। নাটোরের রাজকুমার রামকান্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। নাটোর রাজসাহী জিলার অন্তর্গত। তখন নাটোর রাজ্যের গৌরব-যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষে এত বড় জমীদারী আর কাহারও ছিল না। রাজসাহীর আয়তন ২২৯০৯ বর্গ মাইল স্থিরীকৃত হইয়াছিল। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলা তখন নাটোর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজ্যের আয় ছিল ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। এই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া রাণী ভবানীর নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল।

সেদিন আজিকার মত বাল্যবিবাহের অজুহাত দেখাইয়া জাতির অবনতিসূচনার কথা কেহ উল্লেখ করিত না, আর ইহার ফলে, বালিকাবধূ অকালবার্দ্ধক্যে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া লোকের অনুগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। সেদিন যে আমরা শ্বাসে শ্বাসে মুক্তির বাতাস গ্রহণ করিতাম, স্বাস্থ্য ও সাচ্ছন্দ্যের স্ফূর্ত্তি কোন অবস্থাবিশেষের চাপে ম্লান হইত না। সেদিন বাল্যবিবাহেই আমরা গৃহে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইতাম ; পত্নীকে স্বামীর অর্দ্ধভাগিনী, হরগৌরী-মূর্ত্তিতে দম্পতীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতাম।

রাণী ভবানী শ্বশুরালয়ে আসিয়া সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের গৌরবে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় রাজপ্রাসাদের কেবল শোভা বৃদ্ধি করিলেন না। শিশুকাল হইতে তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার দিকে সমধিক অনুরাগ ছিল। সে যুগে আজিকার মত মুদ্রিত পুস্তক ছিল না ; সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার চর্চ্চাই চলিত, বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল না। রাণী ভবানী পিতার নিকট হইতে সামান্য গণিত ও বর্ণপরিচয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ; শ্বশুরালয়ে এক ব্রাহ্মণ বিদুষীর নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যখন তিনি অধ্যয়ন করিতেন, প্রাসাদের নারীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপবেশন করিত ; অন্তঃপুর-মহিলাদের মধ্যে বিদ্যানুশীলনের ধুম পড়িয়া গেল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ, রামায়ণ, মহাভারত, অসংখ্য সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, রাজনীতিক গ্রন্থ ও অঙ্কশাস্ত্রে

বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। যথাকালে দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে, তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্বামীর রাজকার্য্যে যোগ দিতেন; তাঁর যুক্তি ও বিচক্ষণতার গুণে, অসংখ্য বিপত্তির মধ্যেও নাটোররাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত। আজিকার মত বাংলায় সেদিন ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব আদৌ ছিল না; কিন্তু বাংলার অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা তখনও ছিল, তখনও বঙ্গরমণী স্বাধীনভাবেই আত্মমর্য্যাদা ও কুলগৌরব অটুট রাখিয়া জটিল রাজকার্য্য পরিচালন করার অধিকার পাইত।

রাণী ভবানীর কূট রাষ্ট্রনীতির বলেই নাটোর-রাজ্য মহা-রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁর স্বামীর জীবিত অবস্থাতেই একবার তিনি রাজ্যহারা হন। তখন বৃদ্ধ সুজা খাঁ বাংলার নবাব। তাঁর সুশাসনে জমিদারবর্গ তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; কিন্তু তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িলে, তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার মস্‌নদ অধিকার করেন। ইঁহার রাজত্বকালে বাংলায় অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদাবাদে সুজা খাঁ ও সরফরাজ খাঁ, এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া দুইটী প্রবল রাষ্ট্রনীতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল; বাংলার মস্‌নদে একবার সুজা খাঁ, একবার সরফরাজ খাঁ উপবেশন করিতেন। এই বিপ্লবের দিনে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইত, কত সতীর সতীত্ব নাশ হইত—রাণী ভবানী অতি কৌশলে এই সময়ে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া, রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পাদন

করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ সুজা খাঁর সৈন্যবিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। আত্মবিরোধের অগ্নিতে বাংলা দেশ যখন বিধ্বস্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময়ে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিয়ার প্রান্তরে ইনি সরফরাজ খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করেন। বাংলার প্রজাবর্গ আলিবর্দ্দি খাঁকে মহাসমারোহে বাংলার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল।

নাটোর-রাজ্যের সহিত বাংলার নবাববংশের যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, একজন সৈনিক কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত সেরূপ সদ্‌ভাব রক্ষা করার তেমন প্রয়োজন ছিল না। আলিবর্দ্দি খাঁ বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করা মাত্র, নাটোররাজের জ্ঞাতি শত্রু দেবীপ্রসাদ যথেষ্ট উৎকোচ দিয়া নবাবের নিকট নিজেকেই নাটোর-রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রমাণ করিয়া নূতন সনদ সংগ্রহ করিলেন; তারপর নাটোর রাজপ্রাসাদে আসিয়া মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানীকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রাজশক্তি সহায় থাকায়, মহারাজ রামকান্ত ইহার কোনই প্রতিকার খুঁজিয়া পাইলেন না; কিন্তু মহারাণী হতাশ হইলেন না। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে, বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারামকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জগৎশেঠের গৌরব-সূর্য্য সেদিন মধ্যাহ্নগগনে শোভা পাইতেছে। সম্রাট্ ফেরোক সাহের রাজত্বকালে,শেঠবংশীয়দের

পূর্ব্বপুরুষ "জগৎশেঠ" এই পুরুষানুক্রমিক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং বংশানুক্রমে যিনি প্রধান তিনি মুর্শিদাবাদের রাজসিংহাসন পার্শ্বে উপবেশন করার সম্মান পাইয়াছিলেন।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর জগৎশেঠের ইন্দ্রপুরীতুল্য মহিমাপুর প্রাসাদ আজ নিশ্চিহ্ন। এই প্রাসাদের কক্ষে বসিয়া ব্রিটিশ বণিক্‌গণ পলাশী-যুদ্ধের গোপন মন্ত্রণা করিয়াছিলেন—ভাগীরথী সে কলঙ্ক গর্ভসাৎ করিয়াছেন।

রাণী ভবানীর মুখে জগৎশেঠ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—নবাবের নিকট যথাযথ বিবরণ বলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিতে হইবে। মহারাজ রামকান্ত বিষন্ন মুখে মহারাণীর দিকে চাহিলেন। মহারাণী তৎক্ষণাৎ অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দয়ারামের হস্তে দিয়া বলিলেন—ইহার বিনিময়ে অনেক অর্থ পাওয়া যাইবে; আপনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র হয়, নবাবের নিকট আমাদের আবেদন দাখিল করুন।

আলিবর্দ্দি খাঁ জগৎশেঠের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নথিপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহারাজ রামকান্তকে পুনরায় তদীয় রাজ্য অর্পণ করিলেন। মহারাণী ভবানীর বুদ্ধি-কৌশলেই নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার হইল, মহারাজের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু এ সৌভাগ্য অধিক দিন সহিল না, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন। তখন মহারাষ্ট্রদস্যু

রাঘধজী ভোঁস্‌লা মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে বাংলা দেশ লুণ্ঠন করিতেছেন। আলিবর্দ্দি খাঁ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদস্যু-গণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, রাণী ভবানীর বারুইপাড়া দুর্গে নিজ পরিবারবর্গকে রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে বাংলা দেশ একাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল; তাহার মধ্যে আট চাক্‌লা মহারাণী ভবানীর রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত দেশ বর্গীর হস্ত হইতে রক্ষা করা কি যে দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্বয়ং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকেও বর্গীর খাজনা ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তত্রাচ অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। পরিশেষে আলিবর্দ্দি খাঁ সন্ধিপ্রস্তাবচ্ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন; বর্গীদস্যুদলের ইহাতেই শিরশ্ছেদ হয়; তাহার পর হইতেই বাংলায় বর্গীর অত্যাচার আর তেমন প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই।

মহারাণীর দুই পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। পুত্র দুইটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; কন্যা তারাদেবীকে তিনি যথারীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র সিরাজ বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করেন। সিরাজের সহিত রাণী ভবানীর মনোমালিন্য এই তারাদেবীকে লইয়া। মুর্শিদাবাদের নাটোর-রাজবাটীর সৌধচূড়ে তারাদেবী সুদীর্ঘ কেশদাম এলাইয়া যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, গঙ্গাবক্ষে বজরা হইতে লুব্ধ সিরাজ সেই অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিয়া বিহ্বল হন; পরে

তাঁর দুষ্টাভিসন্ধি রাণী ভবানীকে জ্ঞাপন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজ্যশাসনগর্ব্বিত নবাবের লুব্ধদৃষ্টি হইতে বাংলার নারীসৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখার দায়েই বোধ হয় অবগুণ্ঠনের বন্ধন নারীজাতিকে এমন করিয়া অষ্টপাশবদ্ধ করিয়াছে। রাণী ভবানী নবাবের এই নীচজনোচিত উক্তিতে অতিশয় রুষ্ট হইয়া, পত্রবাহক নবাব-দূতকে অপমানিত করিলেন। নবাব তারাদেবীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন; তখন ভবানী নারীসম্মান রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া রজনীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিলেম। গঙ্গাতীরে তাঁহার লক্ষ্যহীন গতি রুদ্ধ হইল; সম্মুখে দেখিলেন—এক প্রকাণ্ড দেবালয়। ইহাই বিখ্যাত মস্তরাম বাবাজীর আখড়া। বাংলার বিপ্লবযুগে, হিন্দুর ধর্ম্ম, দেবালয় প্রভৃতি রক্ষার জন্য বাংলার সন্ন্যাসিগণ তখন দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। এক একটী আখড়া বা মঠ দুর্গের মত সুরক্ষিত ছিল। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। এই মস্তরাম বাবাজীর অনুগ্রহে, রাণী ভবানী কন্যা তারাদেবীকে লইয়া নাটোর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া নিরাপদ্ হন।

তিনি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, নাটোরে সন্ন্যাসিদের একটী বৃহৎ আখড়া নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা রাজকোষ হইতেই নির্ব্বাহিত হইত।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরদিনের মত

অস্তমিত হইল, রাণীর এ বাণীর অর্থ সে দিন কেহ কর্ণগোচর করিল না—

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘ কাল
একত্র বসতি হেতু, হ'য়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসূত সনে
হইয়াছে পরিণয়, প্রণয় স্থাপিত,
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

ইহা কল্পনা নহে। রাণীর স্বদেশপ্রীতি নিঃস্বার্থ হওয়ায়, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্য দর্শনে সমর্থ ছিল। সে দিন বাংলার রাজন্যবর্গ তাহাদের সম্পদ্ ও সামর্থ্য সম্মিলিত করিয়া যদি দাঁড়াইত, বাংলার ইতিহাস আজ আর একভাবে লিখিত হইত!

ইংরাজ রাজ্য জয় করিলেন, কিন্তু শাসনভার লইলেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—ক্রীড়নক স্বরূপ মির্জ্জাফরের হস্তে শাসনভার দিয়া তাঁহারা বাংলার সম্পদ্‌রাশি অবাধে আত্মসাৎ করিতে পারিবেন। দেশে অরাজকতা দেখা দিল। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারকাহিনী আর নূতন করিয়া

বলিবার নহে। দেশের বস্ত্রব্যবসায় উঠিল। পঞ্চসনী ব্যবস্থায় জমিদারবর্গ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। মিডিল্টন, ডেকার, লরেন্স ও গ্রেহাম নামক চারিজন ইংরাজ কর্ম্মচারী লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইল। এই কমিটি কর্ত্তৃক নূতন নূতন জমিদারের সৃষ্টি হইল, এই জমিদারগণ কর সংগ্রহ করিবার ভার লইলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি ইহার অগ্রণী হইলেন। রাণী ভবানী নিরুপায় হইয়াই এইরূপ প্রথা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁর রাজ্য-মধ্যে ইংরাজ ব্যবসায়ীদের কুটী বসিল। ইংরাজ কুটীয়ালদের সহিত তাঁর মনোমালিন্যও ঘটিল; কিন্তু তিনি তাহা ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তখনও তিনি বিশ লক্ষ সন্তানের জননী। প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির দিকে তিনি এক মুহূর্ত্ত উদাসীন ছিলেন না। কি বিরাট্ শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহাকে যে এই সময়ে স্বাধীনভাবে প্রজাদের সম্পদ্ ও গৌরব রক্ষা করিতে হইয়াছে, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। তাঁর রাজ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের বিস্তার কেহ রোধ করিতে পারে নাই, কার্পাস শিল্প উচ্ছেদ করিতে ইংরাজ ব্যবসায়ী সে দিন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; রাণীর রাজ্যে কিন্তু রেশম, পট্টবস্ত্র ও কার্পাসের ব্যবসা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বাংলার ভাগ্যসূর্য্য যে পশ্চিমে ঝুঁকিয়াছে, একজন নারীর সাধ্যে তাহা আর কতক্ষণ স্থির রাখা যায়? মাননীয় হেষ্টিংস বাহাদুর রাণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমিদারী রংপুরের অন্তর্গত বাহারবন্দর পরগণা কান্তবাবুর পুত্র কৃষ্ণকান্তের নামে করিয়া দেন। ইংরাজ সে দিন বাছিয়া

বাছিয়া নূতন জমিদার সৃষ্টি করিতেছেন। কাশিমবাজার ইংরাজের অনুগ্রহে নবশ্রী লইয়া বাংলার শোভাবৃদ্ধি করিল। নাটোর-রাজলক্ষ্মী সে দিন ম্লান হইলেন। রাণী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ভারতের তীর্থ কাশী যাত্রা করিলেন।

পুণ্যতীর্থ কাশী—রাণী ভবানীর যশশ্চিহ্নে অতুল শোভাময় হইল। কিছুদিন কাশীবাস করিয়া জন্মভূমির আকর্ষণে তিনি একবার নাটোর রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন—সাধের নাটোর হতশ্রী—পরগণার পর পরগণা রাজস্ব-দেনার দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়াছে।

তিনি দেখিলেন—পুত্র রামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনায় বিভোর। পূজার আড়ম্বর বাড়িয়াছে; ছাগবলির ধূমে রাজনগরী রক্তাক্ত, "বুকের পাঁজরা তাঁহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সারা জীবনের উপর দিয়া বাংলার ভাগ্যবিবর্ত্তনের সব তরঙ্গই যে বহিয়াছে"!" তাঁর চক্ষে ভবিষ্যৎ ঢাকা ছিল না। তিনি বাংলার মাটীকে প্রণাম করিয়া, মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

" বাংলার সৌভাগ্যলক্ষ্মী রাণী ভবানী যতদিন জীবিত ছিলেন, বাংলায় দীন দুঃখী, কাঙাল, অন্নহীন ছিল না। ৭৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষে তিনি মুক্তহস্ত হইয়া সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মাতৃপ্রতিমা, শিক্ষা-

সাধনার মূর্ত্তিমতী দেবী ৭৯ বৎসর বয়সে নদীগর্ভে কি ব্যথার বোঝা বুকে লইয়া ডুব দিলেন, তাহা অনুভব করার সন্তান আজ আর বাংলায় নাই। ঋষির কণ্ঠে এই মাতৃমূর্ত্তির বিসর্জ্জনে কেবল এই বাণীই হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলে—

"আবার আসিবে কি মা! মহারাণী ভবানীর মত কন্যা, হে দেশ-মাতৃকা, আবার গর্ভে ধরিবে কি!"

অনাঘ্রাতকুসুম হিন্দুকুমারী

পতিহীনা নারীর জীবনেই তপস্যার বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয়, ত্যাগের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে; নারী তখন দায়ে পড়িয়াই বৈরাগ্যের বিশুদ্ধ অঞ্চল দুলাইয়া জাতিকে আশীর্ব্বাদ করে, স্নেহ অনুরাগের পরশ দেয়। বিধবার জীবনব্রত হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্য, বীর্য্য, সম্পদ্। বিধবার আত্মদাম আছে বলিয়াই, রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে আমরা আশার আলো দেখিতে পাই।

কিন্তু ভারতের সাধনায়, নারীর আরও একটী বিশিষ্ট স্থান ছিল। পতিপুত্রের সহিত নারীর গার্হস্থ্যজীবন আর "বিধাতার অভিশপ্ত" বৈধব্য ব্যতীত, নারীর তৃতীয় স্থান—চিরব্রহ্মচারিণী হইয়া দেশ ও জাতির সেবা করা।

পুরুষের মত নারীও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত আমরা ইহার নিদর্শন পাই।

বিগত শতাব্দীতে, বাংলার কৌলীন্যপ্রথার দায়ে অনেক নারীকে চিরকুমারী থাকিতে হইয়াছে; আজিও স্থানে স্থানে ইহার নিদর্শন যে না পাওয়া যায়, এরূপ নহে; তা' ছাড়া শিক্ষিতা মহিলার মধ্যেও আমরা পরিণত বয়স পর্য্যন্ত

কুমারী-জীবন যাপন করিতে দেখি—মূলগত সঙ্কল্প ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নহে বলিয়া, ইহা প্রতীক্ষাময় বিশৃঙ্খলচিত্ততার অস্বাভাবিক সৃষ্টি, সমাজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের হানিকর—কিন্তু নারীর জীবন-সঙ্কল্প যদি অনাঘ্রাত কুসুমের মত চিরব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকাও হয়, তবে তাহা সমাজে নূতন শ্রী ও শক্তি দান করিবে। নারীশিক্ষার ব্যবস্থা অভারতীয় ভাবে প্রচলিত হওয়ায়, শিক্ষাপ্রচারের মধ্যেও নারীকে এই তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে কখনও দেখিব বলিয়া আশা করা যায় না।

হয়তো আদর্শের আকর্ষণে পুরুষের মত নারীকেও আমরা ব্রহ্মচারিণী বেশে দেখিতে পাইব; সংখ্যাধিক্যও হইতে পারে—কিন্তু সৃষ্টির নিদান যদি সত্যপূত ও স্ব স্ব অব্যর্থ অনুভূতিগম্য না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হইবে।

গৃহীর মত সন্ন্যাসীও স্রষ্টা। গৃহস্থ সৃজন করে আপনাকে দোহন করিয়া আত্মস্বরূপেরই রূপ, রক্তে মাংসে নিজেকেই গুণান্বিত করিয়া; সন্ন্যাসী তাহার উপর ভর করিয়া নূতন সৃষ্টি রচনা করে—অব্যক্ত, অপ্রকাশ যাহা, তাহাকে ব্যক্ত ও প্রকাশ করিয়া অনাগত ও অনির্দ্দেশ্যকে জগতের চক্ষে ফুটন্ত করিয়া ধরাই ব্রহ্মজ্ঞের শিল্পচাতুর্য্য। বিশ্বকর্ম্মার চারু হস্ত সকল জীবনেই লীলায়ত হয়।

আমরা হিন্দুসমাজের বিধবাদিগের মধ্যে যেমন সাফল্য-মণ্ডিত মহিমাময় জীবন খুব, কমই দেখি, সেইরূপ ভারতের অসংখ্য সন্ন্যাসীর মধ্যে বীর্য্যবত্তার সাক্ষাৎকার দুর্লভ বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ, শস্যক্ষেত্র অনাবাদে পড়িয়া থাকিলে প্রকৃতির অযাচিত দানে অতীতে শস্যসঞ্চয় হইতে অনাদৃত যে কয়টা অঙ্কুর-শক্তিসম্পন্ন বীজ ভূপতিত থাকে, তাহাই যেমন আত্মপ্রকাশ করে, ফলে, ফুলে, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে —তদ্রূপ জীবনের অনুশীলন না থাকিলেও, দৈবক্রমে আমাদের সমাজে মানুষের মধ্যে যে প্রাধান্য, যে সদ্‌গুণ সংগুপ্ত আছে, সুযোগের ফাঁকে বিরল ভাবে তাহাই বিকশিত হয়। যাহা অসাধারণ, যাহা বিস্ময়ের বস্তু, আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির কারণ, তাহা অনুশীলনের ফলে ব্যাপকমূর্ত্তি লইয়া সহজ জীবনে পরিণত হইতে পারে ; কিন্তু সে শিক্ষা, সে সাধনা আমরা হারাইয়াছি এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, যে তপস্যা, যে অক্লান্ত শ্রম দিতে হইবে, তাহার অভাব ও অন্তরায়ের মাত্রা এত অধিক, যে আজ দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কাজেই সমাজজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধঃপতনের চূড়ান্ত চিহ্ন প্রকটিত। আর এই ব্যাপক বিকৃত দৃশ্য সহজেই লোকের চক্ষে পড়ে ; এইজন্য বিদেশীর পক্ষে ভারতের বর্ব্বর অবস্থা জগতের চক্ষে আঁকিয়া আমাদের হেয় করা দুর্ঘট হয় নাই।

ভারতের নারী জাতিকে আজ যে অবস্থায় দেখি, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের এরূপ অবস্থা চিরদিন ছিল না। ভারতের গৌরবময় যুগে, নারীর স্থান পুরুষের তুলনায় কোন অংশে হীন ছিল না। পুরুষের মত নারীর কণ্ঠেও বেদের ঝঙ্কার এখনও আমাদের কণ্ঠে নারীর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে।

ঋগ্বেদের পঞ্চমমণ্ডলে, ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারার অগ্নিস্তোত্র আজিও সাক্ষ্য দেয়—ভারতের নারী জ্ঞানজগতে কি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে পাই, কাক্ষীবান্-তনয়া ঘোষা ঋক্ রচনা করিয়াছেন; বৃহস্পতি-ভার্য্যা জুহু, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, শশ্বতী, বধ্রিমতী প্রভৃতি আর্য্যরমণীগণ জ্ঞানচর্চ্চার কি উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বেদের সূক্ত-রচনায় প্রমাণিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন শুনিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনই গভীর; ইহা হইতেই প্রাচীন ভারতে নারীদের মধ্যে কিরূপ বিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থা ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

গার্গীর নামও ভারতের ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ নয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর যে শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে ভারতের নারীজাতির প্রতিভা অসাধারণ, তাহাতে আর সংশয় থাকে না।

রাজর্ষি জনকের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী পৌরাণিক যুগে আর কেহ ছিলেন না বলিলেও ভুল হয় না; কেন না, ব্যাসপুত্র শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকিলে, জনকের সভায় কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিত না; কিন্তু ভারতের সে যুগে নারীজাতি শাস্ত্রজ্ঞানচর্চ্চায় এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে একদিন সুলভা নাম্নী এক ব্রহ্মচারিণী জনককে শাস্ত্রবিচারে

আহ্বান করেন। রাজর্ষি মুনিধর্ম্মধারিণী এই চিরতপস্বিনীর অদ্ভুত যুক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জীবন্মুক্ত জনককেও এই নারী ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া ভারতের ইতিহাসে নারীর গৌরব অতুলনীয় করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিণী শবরীর পবিত্র চিত্র নারী জাতির আর একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইনি মুঞ্জনির্ম্মিত কটিবন্ধ ধারণ করিতেন, পলাশদণ্ড হস্তে তপোবনে বিচরণ করিতেন। তিনি দুগ্ধ-ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা তপশ্চরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল। সীতান্বেষণে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যে বিচরণ করিবার কালে এই তপস্বিনীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। শবরীর পূত ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং যথারীতি প্রশ্ন করিয়া যখন শবরীর উত্তর শুনিলেন—তখন চমৎকৃত হইলেন। শবরী মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেন, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত দর্শনশাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিতেন—প্রাচীন ভারতের এই উন্নতিযুগ আজ যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়।

পৌরাণিক যুগের আর এক ব্রহ্মচারিণী রমণীর চিত্র আঁকিয়া অসংখ্য বিদুষী মহিলার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিব। ইঁহার নাম আত্রেয়ী। ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উন্মত্তা হইয়াছিলেন, চিরকুমারী থাকিয়া ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত

করিয়াছিলেন। সে দিন ভারতের অরণ্যে হিংস্র পশুগণ সামগানের সুমধুর সুর-মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হইয়া ঋষিগণের পাদবন্দনা করিত। বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী নীত হইলে, যথাকালে তিনি পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হইবে বুঝিয়া আত্রেয়ী দেবী বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করিয়া, সুদূর দণ্ডকারণ্যস্থিত অগস্ত্যের আশ্রমে সামবেদ অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা সমাগত ছাত্র ও ছাত্রীদের পরমাত্মজ্ঞান বিতরণ করিতেন। সে কি পবিত্র গৌরবময় যুগ! নারীর চিত্ত স্বার্থলালসায় মলিন হইত না। আত্রেয়ী প্রফুল্ল কমলের মত সারাজীবন ব্রহ্মজ্ঞানে রত ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে সামবেদের ঝঙ্কার যখন উঠিত, তখন বনের পশুপক্ষী নীরব হইত—ভারতের সে শ্রী, সে সম্পদ্ আবার ফিরিয়া আসিবে কি?

তারপর, বৌদ্ধ যুগের কথা। সেদিনও বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারত অবিকৃত ছিল। সেদিনও আচার্য্যের আশ্রমের ছাত্র, ছাত্রী একত্র অধ্যয়ন করিত। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া তখন কি পুরুষ, কি নারী কাহাকেও কলুষ কলঙ্কিত করিত না। বিদুষী কামন্দকীর সহপাঠী ভূরিবসু ও দেবরাত নামক ছাত্রদ্বয়ের নাম শুনা যায়। এই কামন্দকীর নিকট সৌদামিনী নাম্নী এক বৌদ্ধ রমণী সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যথারীতি হিন্দু-প্রথামত মন্ত্রজপ ও হোমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। সৌদামিনী চিরব্রহ্মচারিণী ছিলেন।

বৌদ্ধ যুগে—অসংখ্য ব্রহ্মচারিণীর নাম পাওয়া যায়। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের কাশীসুন্দরী নামক এক কন্যা ছিল, তিনি অল্পবয়সে ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেন। যোগ্য বয়সে কাশীরাজ দুহিতার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলে, তিনি চিরকুমারী ব্রত ধারণ করিয়া ভারতের যোগ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবেন—এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাশীসুন্দরী মহাত্মা কনিকের নিকট যোগবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া, ভগবান্ কশ্যপের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কাশীসুন্দরীর সৌন্দর্য্য লালসায় নানা দেশ হইতে রাজকুমারগণ আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন; কাশীসুন্দরী অসম্মত হইলে, বলপূর্ব্বক হরণ করিবেন বলিয়া তাঁহারা ভয় দেখাইলেন। তখন কশ্যপ ঋষি বলিলেন—"তোমার আপত্তি ইহারা শুনিবে না, তোমায় রাখিলে আমার আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হইবে।" তখন কাশীসুন্দরী বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনি নির্ভয় হউন, ইঁহারা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" তারপর রাজকুমারগণ বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে, তিনি যোগবিদ্যাপ্রভাবে শূন্যে উঠিয়া গেলেন; তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। কশ্যপ ঋষি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এ অপূর্ব্ব বিদ্যা আমি তোমায় দিই নাই—তোমায় আমি কি শিখাইব!"

কাশীসুন্দরী করযোড়ে কহিলেন, "মহাত্মন্! যোগসাধন অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা অধিক উচ্চ—আপনি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না।"

২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা—বারাণসী নগরীতে কৃকী রাজার দুহিতা মালিনী নাম্নী বিদুষী রমণীর নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কৃকী রাজা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সেদিন বৌদ্ধ প্রভাব ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বালিয়া অন্তঃপুরমহিলাদের চিত্ত পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কৃকী রাজা কন্যার বৈদিক শিক্ষা সমাপন করিয়া তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। মালিনী যথারীতি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের সহিত গোপনে গোপনে বৌদ্ধগ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি বৌদ্ধতত্ত্বে অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু এ কথা কেহই জানিত না।

একদিন তিনি কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের উত্তম রূপে ভোজন করাইলেন এবং শাস্ত্র-গ্রন্থাদির রক্ষার জন্য বিচিত্র ক্ষৌমবস্ত্রাদি দান করিলেন। এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে, সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজাকে ইহার প্রতিবিধানের জন্য অনুরোধ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক কাশী-নরেশ যদি স্বীয় কন্যাকে এইরূপ প্রশ্রয় দেন, তাহা হইলে বৌদ্ধ প্রভাব দিন দিন যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে কাশীনগরে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করা কোন মতে সম্ভব হইবে না। রাজা বিচলিত হইয়া কন্যাকে চিরনির্ব্বাসন

দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মালিনী পিতার দণ্ডবিধানের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না; কেবলমাত্র বলিলেন, "নির্ব্বাসনদণ্ড পালন করিবার জন্য আমায় এক সপ্তাহকাল সময় দিন!" পিতা ইহাতে আপত্তি করিলেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তঃপুরে থাকিয়া, কন্যা হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস করার কি আর সুযোগ পাইবে? অধিকন্তু প্রহরীদের সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাতাদি করিতে না পারে। তারপর নির্ব্বাসনের উপযোগী দ্রব্যসম্ভারসংগ্রহের জন্য মালিনীকে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কোন দ্রব্যই আমার প্রয়োজন হইবে না; কেবল এই এক সপ্তাহকাল আমি রাজসভায় বক্তৃতা করিব, আপনাকে ইহা শ্রবণ করিতে হইবে—নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে কন্যার এই একটি মাত্র মিনতি।"

রাজা তাহাতেও অসম্মত হইলেন না। কন্যার চির-নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে এক সপ্তাহ তাহার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবে বৈ ত নয়! ইহাতে আর হিন্দুধর্ম্মের কি ক্ষতি হইবে?

রাজা মালিনীর বক্তৃতামঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাজসভা লোকে লোকারণ্য হইল। ষোড়শবর্ষীয়া রাজকুমারী গ্রীবা উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অগ্নিবর্ষী ভাষায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তার প্রতি বর্ণ শ্রোতাদের অন্তরে বিদ্যুৎ-স্পর্শ দিল। সকলের চক্ষু নত হইয়া পড়িল। তেজস্বিনী রমণীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তীব্র জ্যোতিঃ নির্গত হইল; কেহ সেদিকে

আর চাহিতে পারিল না। একদিন পরেই গোমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হইল। দিনের পর দিন, যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডে তাহাদের অনাস্থা জন্মিল। সাতদিন পরে দেখা গেল, সভাস্থ সকলেই বিদুষী মালিনীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাপ্রার্থী—রাজসৈন্য, দশ সহস্র নগরবাসী, বেদ-বেদাঙ্গদর্শী সভাস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী, আত্মীয়স্বজন—কেহ আর বাকী রহিল না। রাজা স্বয়ং কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "চক্ষের অন্ধকার দূর হইয়াছে। তোমায় মা, নির্ব্বাসনদণ্ড দিতে গিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। এক্ষণে এই কর্ণধারহীন অসংখ্য জীবনের গতি—তোমার হাতে পরিচালিত হইবে !"

মালিনী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারে জীবন ঢালিয়া দিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখিলে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইত। তিনি পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, সারনাথের বৌদ্ধ মঠে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও প্রচারকার্য্যে জীবন দান করিয়া, নারীজগতে অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বাংলায় যে সকল নারী আপন আপন অন্তরে আসক্তি ও কামনার গ্রন্থী রাখিয়া সমাজের উপর গালি বর্ষণ করেন, নিজেদের অবলা ও পরবশীভূতা বলিয়া অনুতাপের অশ্রু ঢালিয়া জাতীয় প্রাণে অশান্তির তরঙ্গ তুলেন, তাঁহাদের সম্মুখে আর একজন মাত্র তপস্বিনী বৌদ্ধ-নারীর পবিত্র নাম উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

মুক্তির আনন্দ বিশুদ্ধ প্রাণে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে, ভিতরের আগুন বাহিরের বারণ মানে না—স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় নাই, কিন্তু নারীর উৎসর্গ কবে কোথায় অবস্থার দায়ে রুদ্ধ হইয়াছে!

আমরা অশোককন্যা সঙ্ঘমিত্রার জীবনচিত্র হইতে দেখি—রাজকন্যা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্রতধারিণীরূপে কি অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। যে জাতির মধ্যে নারীর উৎসর্গ প্রদীপ্ত আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া না উঠে, সে জাতি প্রাণহীন। আজ ভারতের এই অধঃপতন আশঙ্কার কারণ—কেন না, এই নবযুগে একজন নারীর অভ্যুত্থান আমরা লক্ষ্য করিলাম না! প্রাণ যখন ভগবানের ডাকে জাগে, তখন কোন অবস্থার দোহাই দিয়া অশ্রুবর্ষণ শোভা পায় না। দেশের সব কাজই কি পুরুষের উপর নির্ভর করে? নারী কি সমান অংশ মাথা পাতিয়া লইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইবে না? বৈদিক যুগ হইতে সে দিন পর্য্যন্ত দেখিবে—ভারতের যুগধর্ম্মপ্রচারে নারী পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন বাধা মানে নাই, কোন বিপদের ভয়ে শিহরিয়া উঠে নাই; পুরুষের মতই নারী দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন হাসিমুখে বরণ করিয়াছে।

সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধ পরিব্রাজকের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ-রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডে অঙ্গ আবৃত করিয়া জননীর যখন পাদবন্দনা করিলেন, তখন রাজকুমারীর জ্ঞানভাস্বর বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সম্রাট্ কি রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া তোমায় ত্যাগধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন?" সঙ্ঘমিত্রা উন্নতগ্রীবা হইয়া বলিলেন—"না, স্বেচ্ছায় এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছি, ইহা আমার অন্তরের অভিলাষ।"

পুরুষের অপেক্ষা নারীর চিত্ত অধিক নির্ম্মল। পুরুষের কামনা নারীকে পুড়াইয়া ছাই করে। নারী অসহায়ার মত—যেন আর কিছু করিবার নাই তাই—রিরংসার সেবায় আত্মদান করিয়া আমাদের জাতীয় প্রাণকে নির্বীর্য্য করিয়া দিতেছে। নারীর বৈধব্য আত্মরক্ষার তপস্যা; অনাঘ্রাত কুসুমের মত দেশ ও জাতির রক্ষায় একদল ব্রহ্মচারিণী নারীর উৎসর্গের উপরই আমাদের যথার্থ গর্ব্বরক্ষা হইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে অর্দ্ধ জগৎ জয় করিয়াছিল তাহার মুলে ছিল নারীশক্তি, অসংখ্য অনাঘ্রাত কুসুমের দল! বৈধব্যকেই সে যুগে নারী একমাত্র তপস্যা বলিয়া স্থির থাকে নাই; বুদ্ধের মত, শঙ্করের মত, চৈতন্যের মত, নারীও ত্যাগ-তপস্যার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে। সঙ্ঘমিত্রা ভিক্ষু ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় আত্মদান করিয়াছিলেন। সিংহলে তাঁহারই পূত হস্তের বোধিবৃক্ষশাখা আজ প্রকাণ্ড হইয়া অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়-কেন্দ্র হইয়াছে। সুমাত্রা, জাভা, চীন, জাপান সঙ্ঘমিত্রার পদরজে সেদিন পবিত্র হইয়াছিল—ভারতের এ অভিযান কি ব্যর্থ হইবে? সঙ্ঘমিত্রা, মালিনী, ধর্ম্মপালী, ক্ষেমা

প্রভৃতি বৌদ্ধ তপস্বিনীগণ আর একবার ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীজাতির প্রাণে কি আগুন জ্বালিবে না ? কি জানি, কি অজুহাতে আর্য্যমহিলা নিজেদের অবলা বলিয়া আজিও নিশ্চেষ্ট !

মাতাজী তপস্বিনী

স্বার্থকে অনন্ত বিস্তৃত করিয়া দেওয়া ও নিঃস্বার্থ হওয়া একই কথা। ভারতের সন্ন্যাসী এই কারণেই দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এবং সন্ন্যাসীর আত্মদানেই দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়।

পুরুষ যদি এইরূপ নিঃসঙ্গ ভাগবত জীবন লইয়া জাতির প্রাণে আগুণ জ্বালিতে পারে, নারীর পক্ষেও সে অধিকার অসম্ভব নহে। প্রাচীনকালে পুরুষের মত নারীও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সমান অধিকারিণী ছিলেন।

অধুনা নারীজাতিকে প্রণব উচ্চারণ করিতে দেওয়া হয় না। পূজার মন্ত্রে তাহাদিগকে "ওঁ" ইহার পরিবর্ত্তে "নমঃ" বলিয়া কর্ম্ম সাধন করিতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীর পরম জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ভারতের উন্নতিযুগে এইরূপ ব্যবস্থা যে আদৌ ছিল না, তাহা পুরাণ ও ইতিহাসের পাঠক অবগত হইতে পারেন। অধঃপতনের সঙ্গে সমাজনীতি বিকৃত হয়, বীর্য্যহীন জীবন স্বভাবতঃ নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়। আমাদের সমাজ-জীবন শক্তিহীন হওয়ায়, নারীজাতিকেই পতনের বেগ অধিক সহিতে হইয়াছে। অবনতির চরম দেখিতে হইলে

ভারতের অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টি দিতে হয় ; কিন্তু এই কদর্য্য চিত্র জীবনের আদর্শ নহে। দুর্গতির দিনে মানুষের অবস্থা ও আচার দেখিয়া, তাহা জাতির প্রকৃত রূপ বলিয়া নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে।

এক্ষণে চাই—জাতির প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, গৃহের আবর্জ্জনাস্তূপ ঝাঁটাইয়া বিদায় করা। এই জন্য জাতির আদর্শ আমাদের সম্মুখে অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে স্থাপন করার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের প্রদীপ্ত আদর্শ কালপ্রভাবে নিষ্প্রভ। অক্লান্ত কর্ম্মী, কঠোর তপস্বী ভিন্ন এই নির্ব্বাপিত প্রদীপ পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করা অন্য কাহারও সাধ্যে কুলাইবে না। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকেই উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে যে সকল বিদুষী ও নিঃস্বার্থহৃদয়া রমণী নারীজাতির উন্নতিকল্পে আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মহাজীবনের আদর্শ কাহারও অবিদিত নহে। আমরা যাঁহার পুণ্যজীবনের কথা উল্লেখ করিব, তিনি কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ভাবে দেশের নারীজাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই পুণ্যবতী চির ব্রহ্মচারিণী পূজনীয়া মাতাজী তপস্বিনী নামে বাঙ্গালীর নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমান আক্রমণকাল হইতেই ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হয়। একে একে হিন্দু-রাজ্যগুলি প্রভাবহীন হইয়া

পড়ে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ কালে দক্ষিণ ভারতে ভেলোর নামে একটী ক্ষুদ্র করদ হিন্দুরাজ্য ছিল। মহারাষ্ট্রশক্তি তখনও ইংরাজশক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে মাথা নত করে নাই; তখনও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। টিপু সুলতানের বংশধরগণের ষড়যন্ত্রে ভেলোরের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শুনা যায়, ভেলোর দুর্গে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া প্রায় ১১৩ জন ইংরাজ সৈন্য নিহত করে। এই যুদ্ধে ভেলোর-রাজ নিহত হন, টিপুর পরিবারবর্গ বন্দী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

ভেলোর-রাজের একটী পুত্র ও কন্যা ছিল। রাজা হত হইলে, রাজমহিষী সহমৃতা হন। তারপর অসহায় পুত্র কন্যা রায়স্থান নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। রায়স্থানের রাজপুত্রের সহিত ভেলোর-রাজকন্যার বিবাহ হয়। এই ভেলোর-রাজদুহিতার গর্ভে মাতাজী তপস্বিনী জন্মগ্রহণ করেন।

মাতাজী তপস্বিনীর জননী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতেন। মাতাজী জননীর হৃদয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত দুর্গাপ্রতিমার চরণে প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। বয়ঃক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি চির-কুমারী থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তন্ত্র ও বৈদিক শাস্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

চিরকুমারী থাকার সঙ্কল্প স্থির হইলে, তিনি পঞ্চাগ্নি-ব্রত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বৈশাখ মাসে

চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালিয়া ৪১ দিন প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অগ্নিগর্ভে বসিয়া থাকিতে হয়—এই কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া অনেককেই প্রাণ দিতে হয়, কেহ জীবিত থাকে না। মাতাজীর দৃঢ়সঙ্কল্প-ভঙ্গ হইবার নহে। তিনি পঞ্চাগ্নি-ব্রত গ্রহণ করিয়া ৪১ দিন অতিবাহিত করিলেন; তাঁহার স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত ভগ্ন হইল না। বৃদ্ধ রাজা ইহা দেখিয়া মাতাজীর উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

মাতাজী একদিন পঞ্চাগ্নি-ব্রত করিতে করিতে দেবতাদিগকে দর্শন করেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ অধিকাংশই অবাঙ্গালী থাকায়, ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে পঞ্চাগ্নি-ব্রত সিদ্ধ হইলে, দেবদর্শন হয়, পশুপক্ষীদের ভাষা বোধগম্য করিতে পারা যায়। তিনি ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; উপরন্তু ভারতের ভবিষ্য উন্নতির জন্য, তাঁহার কি কর্ম্ম আছে তাহা তিনি অবগত হইয়াছিলেন।

পঞ্চাগ্নি-ব্রত সমাপ্ত করিয়া মাদ্রাজে তাম্রলিপ্তা নদীর তীরে, অগস্ত্যপুর নামক পর্ব্বতে তিনি দীর্ঘদিন তপস্যা করেন। তাঁর তপঃকান্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। তিনি ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছিলেন। কোনও পুরুষ তাঁর নিরুপম সৌন্দর্য্যের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইতে পারিত না; প্রতি অঙ্গে মাতৃত্বের লাবণ্য ঝলসিয়া উঠিত, ভক্তি-অর্ঘ্য ব্যতীত অন্য উপহার সেখানে পৌঁছিত না।

বৃদ্ধ রাজা পৌত্রীর অসাধারণ চরিত্রবল দেখিয়া তাঁহাকে

রাজ্যের একতৃতীয়াংশ দান করেন। তিনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াও বিলাসিনী হন নাই, তপস্বিনী-বেশেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, সন্তানের ন্যায় প্রজাদের স্নেহ করিতেন। তাঁর রাজ্যত্বকালে প্রজাদের কোন দুঃখ ছিল না। তিনি সুশিক্ষাদানে সকলের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া, সর্ব্বতোভাবে সকলকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। যখন তাঁর যশোমহিমা রাজ্যময় ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন তিনি ভ্রাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, সকলের অজ্ঞাতে রায়স্থান ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন।

কিছুদিন পরে নৈমিষারণ্য তীর্থে, তাঁর পবিত্র কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পাণ্ডবকিল্লার নিকট তিনি এক দেবমন্দির স্থাপন করেন। এই সময়ে বুটি নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা তাঁর কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। শুনা যায়, এই ইংরাজ মহিলা রায়স্থানের রাজবাটীতে পালিতা হইয়াছিলেন। মাতাজীর সহিত তাঁর পূর্ব্ব হইতেই প্রীতি জন্মিয়াছিল। রাজপুতানার কমিশনর মিঃ টমসন্ বুটীকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবকিল্লার নিকট মাতাজী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, শুনিয়া মিঃ টমসন্ লোকজন দিয়া ১৫ দিনের মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

মাতাজী রাজবাটী হইতে যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহার সহিত আড়াই কোটী টাকার জহরত ছিল। পথে যেখানে অতিথি হইতেন, সেইখানে তিনি একখানি করিয়া অলঙ্কার উপহার দিতেন। পাণ্ডবকিল্লার দেবমন্দির স্থাপন

করিয়া তিনি পুনঃ পর্য্যটনে বাহির হইলেন, ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করারই তিনি আদেশ পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যার নবাব স্নুজাদালি বেগ রাজ্যভ্রষ্ট হন। তিনি তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। কিছুদিন এইস্থানে তিনি বাস করেন। তাঁর অকাতর দানে দীন দরিদ্রের দুঃখ ঘুচিয়াছিল। এই সময়ে সকলে তাঁহাকে মহারাণী বলিয়া অভিহিত করিত।

ভারতের সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি নেপাল যাত্রা করেন। নেপালেও তাঁর অনেক কীর্ত্তি আছে। পশুপতি-নাথের মন্দির-পার্শ্বে তিনি গঙ্গাদেবীর মন্দির স্থাপন করেন, গঙ্গাদেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু বৎসর এই মন্দির উপলক্ষ করিয়া সাম্বাৎসরিক উৎসব করিতেন। এই উৎসবে তাঁর দানমাহাত্ম্য প্রকাশ পাইত। নেপালে গঙ্গাদেবীর রথযাত্রা আজ নেপালবাসীর একটী উৎসবরূপে গণ্য হইয়াছে; মাতাজীই ইহার প্রবর্ত্তন করেন। তারপর তিনি দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া রামলীলা উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁর ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল। মাতাজীর রামলীলা দ্বারভাঙ্গায় চিরস্মৃতি হইয়া আছে।

ইহার পর, তিনি ভাগীরথী-অধ্যুষিত বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হন। বাংলা দেশেই তাঁর কর্ম্মসমাপ্তি হয়। বাংলার ক্রোড়ে এই চির-তপস্বিনী মাতাজী চির বিশ্রাম লাভ করেন। বাংলায় তিনি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও সূচনা হইয়াই আছে; তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বাঙ্গালীর জীবনেই তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইয়াছে; বাঙ্গালীকেই তাই মাতাজীর অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে।

বাংলার প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অনাচারী নহেন, তাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, ধর্ম্মানুরাগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত নহেন। তিনি কলিকাতায় ৫০০ বাড়ী দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করিতেন। কলিকাতায় মিরার-সম্পাদক পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার বালিকা-বিদ্যালয় নরেন্দ্রনাথ সেনের অনুরোধেই তিনি স্থাপন করেন।

কথিত আছে, তিনি কলিকাতার রাজপথে দুর্গাপ্রতিমা দর্শনের জন্য বাহির হইয়াছেন; এমন সময়ে শুনিলেন, একজন হিন্দু বালিকা অপর একজনকে বলিতেছে, "মাটী ও খড় জড়ান ঠাকুর পূজা করিতে নাই, বরং অমান্য করিতে হয়।" এই কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এই বালিকার মুখে এরূপ কথার কারণ অন্বেষণ করিলেন, এবং বুঝিলেন, খ্রীষ্টান মিশনরীরা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে, সেখানে খ্রীষ্টান মহিলারা অবোধ শিশুদের অন্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষবীজ বপন করিতেছে। এই সকল খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীদিগকে ছাত্রীরা গুরু-মা বলিয়া আহ্বান করিত। মাতাজীর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট অত্যন্ত ব্যথার সহিত এই বিবরণ প্রদান করিলেন। এই কথা

শুনিয়া, তিনি মাতাজীকে হিন্দু-বালিকাদের হিন্দুভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

কিন্তু মাতাজী দেবতার আদেশ ভিন্ন কোন কাজ করিতেন না। তিনি নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কালীঘাটে গিয়া, কালীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার কথার উত্তর দিব।"

পরে মাতাজী কালীমাতার মন্দিরে গিয়া জগদম্বার নিকট আদেশ প্রার্থনা করেন। পঞ্চাগ্নিব্রতসিদ্ধা মাতাজী দেবতাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি মায়ের আদেশ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ আসিতে বলিলেন, "মায়ের আদেশ হইয়াছে।" তারপর, তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য কালীমাতার নাম দিয়া মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন।

সেই সময়ে, কলিকাতায় হিন্দুভাবের শিক্ষা দিবার আর কোথাও ব্যবস্থা ছিল না। মাতাজী স্বয়ং বালিকাদের পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন, নানাপ্রকার স্তোত্রাদি কণ্ঠস্থ করাইয়া দিতেন, সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে থাকিয়া হিন্দু-সংসারে কিরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার উপদেশ দান করিতেন। মহাকালী পাঠশালা হইতে বহু ছাত্রী সংসারে সন্তানজননী হইয়া, অন্তঃপুরকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

কিন্তু তাঁর আরব্ধ কর্ম্ম দেশব্যাপী হইতে না হইতে বিধাতা তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। মাতাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ

করিয়া, আজ কলিকাতায় হিন্দুবালিকাদের চরিত্র পাশ্চাত্যের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সনাতন ভাবে গড়িয়া তোলার কয়েকটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব ও বিপুলতা অনুভূতিগম্য করিয়া, জাতির অর্দ্ধেক অংশকে জাগাইয়া তোলার ইহাপেক্ষা বিস্তৃত আয়োজন চাই। ইহার জন্য নিঃস্বার্থ, অনাঘ্রাত কুসুমের মত পবিত্র অসংখ্য ব্রতধারিণী রমণীর প্রয়োজন—বাংলার নারীজাতি সে আয়োজন করিবেন কি ?

হিন্দুনারীর বীরত্ব

দিল্লীর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সম্রাট্ আকবর অতিশয় বিস্মিত হইয়া সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতের কোনও ইতিহাসে হিন্দু-বিধবা রাণী দুর্গাবতীর মত সমর-নিপুণা রমণীর পরিচয় পাইয়াছ কি ?"

সম্রাট্ আকবর কূট রাজনীতি-কৌশলে হিন্দুস্থান মোগল-পতাকার অধীনে আনিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান-দের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন, রাজকার্য্যে হিন্দু-নেতৃগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন; হিন্দু-মুসলমানভেদ থাকিতে ভারতরাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে না, এজন্য সামাজিক ব্যাপারেও আকবর হিন্দুদের এক করিয়াছিলেন। তোডরমল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দুবীরগণ দিল্লীশ্বরের কুট-মন্ত্রে বংশমর্য্যাদা হারাইয়া মোগলের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ইহা দ্বারা উজ্জ্বল হয় নাই। সম্রাট্ আকবরের মহত্ত্ব শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে যেমন শোভা পাইয়াছে, পরাধীন হিন্দুজাতির এই আত্মদান তেমনি দাসমনোবৃত্তির পরিচয় বলিয়া ভারতের ইতিহাস মসীময় করিয়াছে। রাণা মানসিংহের সহিত একাসনে বসিতেও ঘৃণা করিতেন; আকবর এই সকল কৃতদাস অপেক্ষা চিরশত্রু প্রতাপকেই বেঁ

অধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার অসংখ্য আচরণে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। দুঃখ বিপদ্ বরণ করিতে অসমর্থ, কাপুরুষ জাতি মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা চিরদিনই বলি দেয়। কিন্তু তবুও ভারতবর্ষ আত্মপাপে হস্তে পদে লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া দীর্ঘদিন অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও, মনুষ্যত্বের জয় দিয়াছে। এই মহত্ত্ব ও বীরত্ব ভারতের মজ্জাগত সম্পদ্, তাই ভারত আজও বৈদেশিক প্রবল সভ্যতা ও শক্তির মধ্যে আত্ম-বিলয় করে নাই; বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভারতমূর্ত্তিতে পুনরায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে চাহে। এই অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা বুঝি তাহার যাইবার নহে, ভারতের ইহাই অমরত্ব।

ভারতের পৌরুষ ও গরিমা আঘাতে আঘাতে মূর্চ্ছিতপ্রায়; কিন্তু মূলতঃ ইহা নিহত হইবার বস্তু নয়। তাই মাঝে মাঝে দারুণ নৈরাশ্যের মাঝে ভারত-স্বরূপের মহিমাময় মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে পড়ে; আর গর্ব্বে বক্ষ ফুলিয়া উঠে, উৎসাহে ধমনীতে নূতন জীবন অনুভব করি।

অন্যদিকে আবার দেখি—বিজয়ী বিদেশীর চরণে হিন্দুত্বের আত্মবলি—যেন নিরুপায়, একান্ত অসমর্থ হইয়া প্রাণরক্ষার আয়োজন করিতেছে। যে প্রাণ ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের বিনিময়ে বিক্রয় করা যায়, সে প্রাণ সত্য ভারতের স্বরূপ নয়। শুধু আজ নয়, ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে।

আরবের মরুদুর্গে কোটীকণ্ঠে যে দিন মহম্মদের ধর্ম্মবিশ্বাস অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড়াইয়া ঘোষণা করিল—বিশ্ব-মানবজাতির মাথা ইস্‌লাম ধর্ম্মের পতাকাতলে নত করিব, সেইদিন ভারতের প্রশান্ত সমাহিত জীবন ইহা হঠকারিতা বলিয়া আত্মগৌরবের মহিমায় হাসিয়াই উড়াইয়া দিল ও জ্ঞানোন্নতির চরম চূড়ায় বসিয়া সেদিন সে লক্ষ্য করে নাই—কি অসাধারণ প্রাণশক্তির উত্তাল তরঙ্গ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চার দেউল চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশালতার মাঝে প্রতিষ্ঠার যে ভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা লক্ষ্যে পড়ে না। ভারত তার বিপুল জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, নীতি লইয়া উদাসীন ছিল। ভারতের কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনীতে অহোরাত্র শাস্ত্রচর্চ্চার কণ্ঠধ্বনি তীর্থযাত্রীর প্রাণে অদ্ভূত আনন্দের সঞ্চার করিত; কিন্তু আরবের দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া কৃপাণ হস্তে যাহারা পঙ্গপালের মত ভারত-তীর্থে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহারা ভারতের ধর্ম্ম মানিল না, ত্যাগবৈরাগ্যের মর্য্যাদা বুঝিল না।—অসাধারণ প্রতিভা ও গবেষণার দ্বারা হিন্দুজাতি ভারতে শিক্ষা, সাধনা, শিল্পের যে বিচিত্র হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছিল, তাহা ইহাদের পদাঘাতে চূর্ণ হইতে লাগিল। বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল, তখন বন্দনা-স্তুতি-মন্ত্রে তাহাদের নিরস্ত করার যুক্তি হইল। তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়ার আশা নাই দেখিয়া অভিশাপ মারণ-মন্ত্র উচ্চারিত হইল। শক্তি-সিদ্ধ জাতি হাসিয়া দেবালয় ভাঙ্গিল, বিদ্যামন্দির ভাঙ্গিল, দেবমূর্ত্তি পদতলে দলিল। ভারতের সাধনা, ভারতের শাস্ত্র, ভারতের গর্ব্ব—

াবই জগতের চক্ষে ছায়াবাজী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ভারত যে শক্তিহীন তাহা নহে ; কোন অভিশাপে সে শক্তি ব্যূহবদ্ধ হয় নাই, তাই এই দুর্দ্দশা—কিন্তু আজিও সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এই সুদীর্ঘ ইতিহাস বড় অপমানের ইতিহাস, প্রতিপদে পরাজয়ের ইতিহাস, তবুও যে ভারতের ার্ব্ব ভুলিতে পারি না—এ কি মোহ, না ইহার পশ্চাতে কোন াত্যের বীজমন্ত্র আছে ?

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুনদের মোহানায় দেবলবন্দরের হিন্দুরা একখানি আরব্য পোত অধিকার করে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কি মহাশক্তি ভারতাক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভারতের হিন্দুজাতি সে সন্ধান রাখিত না। তাই খলিফাতের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিল, হিন্দুরাজ দাহির সে আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া বুঝিলেন—হিন্দুস্থান বীরজননী বটে, কিন্তু জগতে আরও বীর-প্রসবিনী আছে। মুসলমানগণও হিন্দুজাতির বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাজপুত বীর মুক্ত অসি হস্তে, দুর্জ্জয় মুসলমানবাহিনীর গতিরোধে সমর্থ হইল না। সিন্ধুদেশের কিয়দংশ এই সময়ে বিজেতৃদের হস্তগত হইল। কোনও হিন্দু এই অপমান জীবন থাকিতে সহিল না। ভারতের বীর-পুত্র সম্মুখ সমরে মরিল। নারীগণ জহরব্রতে প্রাণ বলি দিল। প্রাণের প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্য অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই ; জাতি ও বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার এই প্রথা ভারতবর্ষ পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে !

বীরত্বের এই কঠোর নিদর্শন সকলের পক্ষে পালন করা সহজ হইল না; কাপুরুষতার চরম দেখা যাইতে লাগিল। গুজরাট ও মালবের রাজমহিষী কমলা বিজয়ী পাঠানবীরের অঙ্কশায়িনী হইলেন—এই কলঙ্ক মুছিলেন চিতোর-রাজলক্ষ্মী পদ্মিনী। সে ইতিহাস সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—সুতরাং অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের নারী এই দুঃসময়ে যে বীরত্ব, যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাসে এক অভিনব বৃত্তান্ত হইয়া আছে। জয়চাঁদের ষড়যন্ত্রে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ যখন রাজ্যহারা হইলেন, সম্মুখ সমরে প্রাণ দিলেন, সেদিন হিন্দুসৈন্য বিচলিত হইয়া পৃষ্ঠ ফিরাইলেন। কিন্তু রাণী সংযুক্তা মূর্ত্তিমতী চণ্ডীর ন্যায় উন্মুক্ত অসি হস্তে রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিলে, কি ভীষণ কুরুক্ষেত্র তিরৌরির প্রান্তরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আজিও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! ভারতের দুর্ভাগ্য—হিন্দুস্থান সেদিনও এক হয় নাই। কাজেই জহর-ব্রতের যে আগুন দিল্লীর রাজান্তঃপুরে জ্বলিল তাহার অগ্নিশিখা নাকি বহু দূর-দূরান্তর হইতে বিজেতা মুসলমান দেখিয়া ভাবিয়া পায় নাই—ভারত এমন করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়া, কেমন করিয়া আত্মগরিমা রক্ষা করিবে!

ভারতনারীর গৌরবকাহিনী লিখিতে ব্যাসদেববিরচিত মহাভারতের ন্যায় বিপুল গ্রন্থ হইবে, আমরা দেশের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ দুই একজনের উজ্জ্বল জীবন-দৃষ্টান্ত দেখাইতে

চাই, আর ভারতের শক্তি নারীজাতিকে জিজ্ঞাসা করি—'ওগো জননি, তোমার দেশ, তোমার ঐশ্বর্য্য, তুমি ভারতের রাজলক্ষ্মী, সন্তানের শিরায় শিরায় বীরত্বের গর্ব্ব পুনঃ জাগ্রত করার জন্য কি উদ্বুদ্ধ হইবে না ?

রাণী দুর্গাবতী

আমরা রাণী দুর্গাবতীর কথা সংক্ষেপে বলিব। ইনি রোটা ও মহোবার অধিপতি চান্দল বংশীয় শালিবাহন রাজার দুহিতা ছিলেন। গড়মণ্ডলের রাজা দলপতি ইঁহাকে বিবাহ করেন; কিন্তু স্বামীসম্ভোগ তাঁর ভাগ্যে দীর্ঘ দিন ঘটে নাই। পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র লইয়া ইনি বিধবা হন। পুত্রের নাম বীরনারায়ণ। ভারতের নারী অবলা নহেন। প্রজাবৃন্দ দেখিলেন—শিশুকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজ্ঞী যেরূপ কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দিল্লীর সিংহাসনে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট্ আক্‌বর উপবিষ্ট থাকিলেও, গড়মণ্ডলের কোনরূপ বিপৎসম্ভাবনা নাই।

গোণ্ডাজাতীয় অধিবাসিগণ যেমন সাহসী, তেমনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। রাণী দুর্গাবতী প্রজাবর্গ লইয়া নূতন নূতন সেনাদল গঠন করিলেন; শিশু বীরনারায়ণকে অশ্ব-পরিচালনায়, ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। গড়মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল, তাহার উপর তিনি মাঝে মাঝে দুর্গ রচনা করিলেন। মুসলমান শক্তি একে একে ভারতের অধিকাংশ হিন্দুরাজ্য গ্রাস করিয়াছিল; কিন্তু

মহারাণী দুর্গাবতীর জীবনকালে গড়মণ্ডল শত্রু-কবলিত হয় নাই।

সম্রাট্ আকবর মালব জয় করিয়া, সুজা-উলখাঁকে ইহার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। ইঁহার পুত্র বাজবাহাদুর, ইনি একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন। রাণীর সহিত তাঁহার বহুবার সংগ্রাম হয়; কিন্তু কোনবারই তিনি রাণীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই, বরং বারবার পরাজিত হইয়া রাণীকে ভয় করিয়া চলিতেন।

বাজবাহাদুর বড় অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মালবের প্রজাবৃন্দ ষড়যন্ত্র করিয়া ইব্রাহিম খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে মালব-সিংহাসন দিবার জন্য উদ্যোগ করে; রাণী দুর্গবতী ইব্রাহিম খাঁকে সাহায্য করিতে সম্মতা হন। বাজবাহাদুরের বিপুল সেনাবাহিনী এই বিপ্লব দমন করিতে যখন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল, তিনি দেখিলেন—গড়মণ্ডলের সেনাবাহিনী ইব্রাহিম খাঁর সহিত যোগ দিয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া জয়াশা ছাড়িয়া, রাণী দুর্গাবতীর চরণতলে মুকুট রাখিয়া, তাঁহাকে এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। বাজবাহাদুরকে সমগ্র মালববাসী অতিশয় ভয়ের চক্ষে দেখিত; সেই মহাবীর কিন্তু রাণী দুর্গাবতীর নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন অচঞ্চলা থাকেন না। আকবরের এক প্রিয় কর্ম্মচারী সম্রাটের অনুজ্ঞা পাইয়া পান্না নামক স্বাধীন রাজ্য জয় করেন। 'এই' ব্যক্তি

আসফ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে মালব দেশের কারা নামক প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করেন।

আসফ খাঁ রাণী দুর্গাবতীর বিপুল প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন, গোপনে তাঁহার সৈন্যবল ও ধনবলের হিসাব লইলেন। রাণী দুর্গাবতী এই আসফ খাঁকে লঘু চক্ষেই দেখিতেন। তিনি স্বয়ং সম্রাট্কেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু আসফ খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া, দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিবেন বলিয়া আদেশ চাহিলেন। সম্রাট্ দুর্গাবতীর সাহস ও বীরত্বের কথা অবগত ছিলেন; বিশেষতঃ, এই বিধবা হিন্দুনারীর সহিত সংগ্রাম করিতে তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই—কিন্তু আসফ খাঁর বার বার প্ররোচনায় রাজ্যলোলুপ হইয়া, দিল্লী হইতে অসংখ্য সৈন্য মালব দেশে প্রেরণ করিলেন।

সম্রাট্কে সম্মত করিয়া আসফ খাঁ প্রথমে গড়মণ্ডলের সীমান্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণীর বিশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; কিন্তু চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে দেখিয়া, তিনি তদীয় মন্ত্রী অধর নামক একজন কায়স্থকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সহসা আসফ খাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণের কথা শুনিয়া তিনি প্রথম প্রথম উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন; তারপর সংবাদ পাইলেন—আকবরের বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহারই রাজ্যান্তর্গত দামুদা নামক নগরে সমবেত হইয়াছে। তখন

তিনি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে সৈন্যদের আহ্বান করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি কুপিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয় রমণীকে জাতির স্বাধীনতারক্ষায় উদ্বুদ্ধ দেখিয়া আবার সৈন্যব্যূহ গড়িয়া উঠিল। তিনি আসফ খাঁর সম্মুখীন হইয়া প্রলয়-ঝড় তুলিলেন। তাঁর আক্রমণপ্রভাবে আসফ খাঁ প্রমাদ গণিলেন, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পিছু ফিরিলেন। অসংখ্য সম্রাট্‌সৈন্য নিহত হইল। আসফ খাঁ এই রাজপুত মহিলার অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি নতমুখে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রার্থনা করিলেন।

সম্রাট্ তাই এই রাজপুতনারীর বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতের ইতিহাসে হিন্দুস্থান ছাড়া আর কোথাও নারীজাতির এরূপ বীরত্বের কাহিনী শুনা যায় কি না!"

সভাসদেরা বলিল—"মহারাজ, বৈদিক যুগে দুই একজন মহিলার নাম শুনা যায়, কিন্তু তাহা উপকথা বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিই। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি—বেদের ইন্দ্রসেনা, পুরাণের হৈমবতী মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন মহারাণী দুর্গাবতী রূপে।"

আসফ খাঁর পরাজয়ে, সম্রাটের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কাজেই দায়ে পড়িয়াই, তিনি দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরকুশল সৈন্যবাহিনী মালবে প্রেরণ করিলেন। সমুদ্রতরঙ্গের মত সৈন্য-স্রোতঃ দেখিয়া গড়মণ্ডলের অধিবাসী ভয় পাইল।

কিন্তু রাণী দুর্গাবতী নির্ভীকভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিলেন, মন্ত্রী অধরকে প্রবল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করিয়া দিলেন, ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক বীরনারায়ণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন ও স্বয়ং চামুণ্ডার ন্যায় অসংখ্য সৈন্য লইয়া মোগলবাহিনীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর সে তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া শত্রুসৈন্য প্রমাদ গণিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘন ঘন কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। গিরিশৃঙ্গ হইতে গণ্ডসেনাবাহিনী বর্ষাপাতের ন্যায় শর বর্ষণ করিল। রণরঙ্গে ধরিত্রী যেন টলমল করিতে লাগিল। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল, জয়নির্দ্ধারণ কোন পক্ষে হইবে তাহা স্থির হইল না। সন্ধ্যা হইলে, রাণী সেনাবাহিনীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বিপুল মোগলবাহিনীর সম্মুখে আমাদের এই নগণ্য সৈন্যব্যূহ যে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়াছে, তাহাতে জয়লক্ষ্মী আমাদেরই, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। সন্ধ্যা হইল, এস আমরা যুদ্ধক্ষান্ত হই; তারপর রাত্রির গভীর আঁধারে অতর্কিতে মোগল শিবির আক্রমণ করিয়া, বিরুদ্ধ পক্ষকে ছারখার করিয়া দিব।" হায়, ভারতের ব্যক্তিগত গর্ব্ব—সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত নেতৃত্বের সম্মান কেমন করিয়া দেখাইতে হয়, তাহা আমরা দেখাইতে পারিলাম না; অনৈক্য ও মতভেদ আমাদের সোণার দেশ ছারখার করিল! রণমত্ত বীরেন্দ্রমণ্ডলী রাণীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না,

তাঁহারা সারা রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়া মোগলবাহিনী বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাণীর যুক্তি টিকিল না; তিনি মনোভঙ্গে ক্ষুণ্ণ হইয়া শিবিরে ফিরিলেন। গড়মণ্ডলের অর্দ্ধেক সৈন্য রাণীর অনুসরণ করিল; আর অর্দ্ধেক সংগ্রামক্ষেত্রে কেবল জিদের বশবর্ত্তী হইয়া সংখ্যা হ্রাস করিতে লাগিল।

প্রভাতে রাণী দুর্গাবতী রণক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন—সারা রাত্রির রণক্লান্তি তাঁহার সেনাবাহিনীকে অবসন্ন করিয়াছে। তিনি নিরাশ হইলেন; কিন্তু প্রাণ থাকিতে মোগল সৈন্যকে রাজ্য জয় করিতে দিবেন না। তিনি মন্ত্রী অধরকে সঙ্গে রাখিলেন, কুমারকে সম্মুখে আগাইয়া দিলেন। রাণীর আগমনে সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের আগুন জ্বলিল। কিন্তু সে কয়েক দণ্ড মাত্র! অসংখ্য মোগলসৈন্য সারারাত্রি সৈন্যদল পরিবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং ক্লান্তির ভারে তাহারা ম্লান নহে; অল্পসংখ্যক গড়মণ্ডলের রাজসৈন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কুমারের চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শত্রুব্যূহ হইতে একটা বন্দুকের গুলি কুমারকে আঘাত করিল, কুমার হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। রাণী দুর্গাবতী দ্রুত সন্তানকে স্বীয় অঙ্কে উঠাইয়া তাঁহাকে চিকিৎসাশিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ভীমবেগে শত্রুদের আক্রমণ করিলেন, আসফ খাঁকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুত ধাবিত হইলেন। তাঁর অসীম সাহস দেখিয়া অঙ্গরক্ষী দল প্রমাদ

গণিল ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না। এমন সময়ে একটা লৌহশর তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিল। তিনি বামহস্তে তাহা উৎপাটন করিয়া দক্ষিণভুজে শত্রুসৈন্য টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতে লাগিলেন। সহসা আর একটা তীক্ষ্ণ শর তাঁর কণ্ঠে বিদ্ধ হইল। তাহাও উপড়াইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু রুধির বন্যার মত সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল। তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, মন্ত্রী অধরকে বলিলেন—"অধর, চির বিশ্বাসী ভৃত্য,—মৃত্যু সন্নিকট, প্রভুর একটা কথা রাখিবে!"

অধর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"বলুন, রাজ্ঞী—আপনার কাজে প্রাণবলি দিব!"

রাণী বলিলেন—"সে কাজে রাজপুত বীর চির উদ্যত—আমার কণ্ঠচ্ছেদ কর, শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক স্পর্শিত হওয়ার পূর্ব্বে আমায় হত্যা কর ; আমার অনুরোধপালনে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না—ঐ মোগল সৈন্য আমায় বন্দী করিতে আসিতেছে!"

অধর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাণীর মুখের দিকে চাহিল। রাণীর সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, ক্ষীণ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ, তবে এই শির লইয়া আমায় যথাবিধি শ্মশানে লইয়া হিন্দুমতে দাহ করিও।" সেই মুহূর্ত্তে অসি ঝলসিয়া উঠিল, অধর স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—রাণী স্বহস্তে নিজ শির ছিন্ন করিয়া ভূপতিতা হইলেন।

তার পর, যাহা চিরদিন হয় তাহাই হইল। হিন্দুর রাজ্য লুঠ হইল, মোগল সম্রাটের ধনকোষ পূর্ণ হইল। বীরাঙ্গনার রক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত হইল, হিন্দু ভারত তবুও জাগিল না। ভারতের ইতিহাস বীভৎস; কিন্তু বড় করুণ, বড় মর্ম্মন্তুদ!

অহল্যাবাই

হিন্দুনারীর আদর্শ-চরিত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া বাহির করিতে হয় না। ভারতের ঘরে ঘরে অসংখ্য বিদুষী রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। ধর্ম্মে, বীরত্বে, বিদ্যা-চর্চ্চায়, রাষ্ট্রপরিচালনায়, ভারতরমণী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

রাণী দুর্গাবতীর ন্যায় মহারাষ্ট্ররমণী অহল্যাবাই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মালব দেশের আহম্মদনগরের অন্তর্গত পাথরডী নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম আনন্দরাও সিন্দে। তিনি কৃষিজীবী ছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে ভাস্করপণ্ডিত যেরূপ ধনরত্ন-লুণ্ঠনে বাংলায় অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্রদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীরাও পেশোয়ে দিল্লীর নিকট-স্থিত জনপদসমূহ লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিলেন। বাজীরাওয়ের একজন প্রধান সেনাপতি মলহরজী হোলকার গুজরাট প্রদেশ লুঠ করিতেছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, মহারাষ্ট্র বীরগণ ভারতে হিন্দুরাজ্যস্থাপনের জন্য এইরূপ ভাবে অর্থসঞ্চয়ে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব

এমনই প্রবল হইয়াছিল, যে তৎকালে দেশের রাজশক্তি মহারাষ্ট্র-সেনাপতিদের সহিত প্রচুর অর্থদানের ব্যবস্থা করিয়া সন্ধি করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ইংরাজ বণিগ্বেশে তখন ভারতে পা বাড়াইয়াছেন মাত্র। বর্গীর ভয়ে বিচলিত হইয়া, তাঁহারা মহারাষ্ট্ররাজের নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররমণী দুরন্ত অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতেছে, ইংরাজ দূত ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভারতের রমণী যে আজিকার মত একান্ত অবলা ছিল না, ইহাও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাজীরাওয়ের সেনাদার মলহর রাও হোলকার পাথরডী গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—একটী বালিকা মন্দিরচত্বরে বসিয়া পুরোহিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছে। তাহার উচ্চারণ ও আবৃত্তির স্পষ্টতা ও মধুরতা শ্রবণ করিয়া, মলহর কন্যাটীর সহিত নিজপুত্র খণ্ডরাওয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অহল্যাবাইয়ের পিতা কন্যার এইরূপ সৌভাগ্যে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং যথাকালে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

মলহর রাও প্রথম পাঁচশত সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু বাজীরাওয়ের পরম শত্রু নিজাম আলিকে পরাজিত করিয়া ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের অত্যাচার হইতে কঙ্কন প্রদেশ রক্ষা করিয়া যশস্বী হন। বাজীরাও ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মলহরকে নর্ম্মদার উভয়তীরবর্ত্তী বারটী জিলা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।

মালবদেশের অধিকার লইয়া, মহারাষ্ট্র ও মুসলমানের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে মলহর অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরাজিত মুসলমানেরাও মলহরের যুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করিতে বাধ্য হন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও সত্তরটী জিলা ও ইন্দোর প্রদেশ মলহরকে পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি মালবদেশের উপরেও মলহরকে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ সামান্য সৈনিকজীবন লাভ করিয়া স্বীয় বীরত্ব প্রভাবে তিনি দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মলহর রাও হোলকার ইন্দোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া অতি গৌরবের সহিত রাজত্ব করেন।

দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত মলহর রাওকে সম্মান করিতেন। তিনিই দ্বিতীয় আলমগীরকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইয়াছিলেন। মোগল শক্তি তখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, মহারাষ্ট্রশক্তির নিকট মোগলসম্রাট্ মাথা তুলিতে পারিতেন না; বরং সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের নিকট তিনি অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতেন।

রোহিলা-যুদ্ধে, মলহর রাও দিল্লীশ্বরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু রণক্ষেত্রে গিয়া রোহিলাদের সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে, বহুসংখ্যক মহিষ ও বৃষের শৃঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া, শত্রু শিবিরের বিপরীত দিকে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, তিনি অপর দিক্ হইতে ঘোর রজনীতে রোহিলাদের

আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্য মলহরের চাতুরী বুঝিল না; তাহারা মনে করিল—উভয় দিক্ হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়াছে। অকস্মাৎ নিজদিগকে এইরূপ বিপন্ন ভাবিয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইল। এই জয়সংবাদ দিল্লীতে গিয়া পৌঁছিলে, সম্রাট্ মলহরকে চান্দোর প্রদেশ প্রদান করিতে চাহিলেন; কিন্তু প্রভুপরায়ণ মলহর বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“আমি ইন্দোরের স্বাধীন নৃপতি হইলেও, বাজীরাও পেশোয়ের ভৃত্য মাত্র, তাঁর অনুমতি না হইলে চান্দোর প্রদেশ লইতে পারি না।” সম্রাট্ মলহরের মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে “দেশমুখ” উপাধি প্রদান করেন। ইন্দোরের অধিপতিরা এখনও এই উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কৃষিজীবী আনন্দরাওয়ের কন্যা অহল্যাবাই এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দোররাজের পুত্রবধূ হইয়া রাজপ্রাসাদে অতিশয় সমারোহের সহিত প্রবেশ করিলেন। দরিদ্রের কন্যা হইলেও, তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সংস্কৃত গ্রন্থে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই অম্বাদাস নামক একজন সদাচারী ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। রাজবাটীতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মচর্চ্চা করিলে পাছে কেহ বিরক্ত হয়, এইজন্য তিনি বাহ্য আচরণ ছাড়িয়া অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁর বুদ্ধি ও ব্যবহারিক জগতের সর্ব্ব বিষয়ে অকাট্য যুক্তি দেখিয়া, মলহর রাজসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে পুত্রবধূর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু এ সৌভাগ্য বিধাতা অধিকদিন তাঁহাকে ভোগ করিতে দিলেন না। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভের দুর্গ রক্ষা করিতে দিয়া খাণ্ডেরাও নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তাঁর একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। স্বামীর সহিত সহমরণে প্রস্তুত হইলে, বৃদ্ধ শ্বশুর সাশ্রুনয়নে পুত্রবধুকে পুত্রকন্যার মুখ চাহিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ কবিলেন এবং এই অনুরোধ পালন না করিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অহল্যাবাই গুরুজনবাক্য অমান্য করিলেন না; তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ রাজার হস্ত হইতে রাজ্যভার নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়া, দিবারাত্র রাজ্যশাসনব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া, স্বামী-শোক বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন।

ইন্দোর রাজধানীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি ইন্দোরে প্রয়োজনমত সৈন্যাদি রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য ও সামন্তাদি লইয়া বাফগাঁও নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

অহল্যাবাইয়ের নিপুণ রাজ্যপরিচালনার ব্যবস্থায় ব্যয়সঙ্কোচ হইল এবং প্রজাবর্গ অধিকতর সুখ ও সম্পত্তি লাভ করিল। তিনি মাঝে মাঝে ইন্দোরে আসিয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিতেন ও হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতেন। রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁর রাজকার্য্যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে মলহররাও হোলকার—মহারাষ্ট্র প্রদেশের পুরুষসিংহ মহাগৌরবে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁর রাজত্বকালে, মহারাষ্ট্রে অসংখ্য স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিলেও, যদি তাহারা একত্র হইয়া পাণিপথের যুদ্ধে স্বদেশ ও স্বাধীনতার রক্ষায় উঠিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আজ ছত্রপতি শিবাজীর জয়চ্ছত্র উড়িত। সেদিন সদাশিব পেশোওয়ে মলহরের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, গৃহবিবাদের ছিদ্র ধরিয়া বহিঃশত্রু মহারাষ্ট্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। ভারতের সে কলঙ্কের ইতিহাস পর্ব্বে পর্ব্বে মসীবর্ণে রঞ্জিত। সে ইতিহাস পড়িলে, ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হয়। এমন হতভাগ্য জাতি পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাইবে না।

অহল্যাবাইয়ের পুত্রের নাম মালেরাও ও কন্যার নাম মুক্তাবাই। তিনি মালেরাওকে সিংহাসনে বসাইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মালেরাও পিতৃপিতামহের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার চরিত্রবল ছিল না; অধিকন্তু তিনি লোকজনের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন না—উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের বেত্রাঘাত করিতেন, সাধু সন্ন্যাসীদের অপমান করিতেন। তিনি বৃশ্চিক, সর্প পূরিয়া পণ্ডিতদের পট্টবস্ত্র ও জলপাত্র দান করিতেন; তারপর ঐ সকল বস্ত্র হস্তে লইয়া যখন তাঁহারা বিষাক্ত দংশনে যন্ত্রণায় কাতর হইতেন, তখন মালেরাওয়ের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার

দোষগুলি আরও বাড়িয়া উঠিল ; অধিকন্তু তিনি মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইলেন। অহল্যাবাই পুত্রের এবম্বিধ আচরণে নিরতিশয় ক্ষুন্ন হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার চরিত্রের সংশোধন যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেন। বিধাতা তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপে শুনিলেন—অধিক অত্যাচারে মালেরাওয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

অহল্যাবাই একে একে শ্বশুর, স্বামী ও একমাত্র পুত্র হারাইয়া নিদারুণ শোকগ্রস্ত হইলেন ; কিন্তু কঠোর রাজ্যভার বহন করিতে যদি অসমর্থ হন, তবে নিজ সামর্থ্য-বলে যে পুরুষসিংহ এই যশোগর্ব্ব-মণ্ডিত মালব দেশ গড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার নামে যে কলঙ্ক হইবে—তাই তিনি কটিবন্ধে কাপড় জড়াইয়া, স্বয়ং রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন. রাজ্যের সুশাসন অক্ষুন্ন রহিল।

কিন্তু এত বড় বিপুল রাজ্য একজন নারীর উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করায়, স্বার্থান্বেষী যাহারা তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য ছিনাইয়া লইবার ষড়যন্ত্র সুরু করিল। মলহর রাওয়ের অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই গঙ্গাধর যশোবন্ত প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হইলেন। অহল্যাবাইয়ের মত চতুরা, বিচক্ষণা নারী সিংহাসনে থাকিতে তাঁহার স্বার্থপূরণ অসম্ভব বুঝিয়া, তিনি প্রস্তাব করিলেন—শোকসন্তপ্ত হৃদয় লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইতেছে, অতএব রাজ্ঞীর পক্ষে কোন তীর্থে

গিয়া ভাগবত উপাসনায় জীবন দান করাই প্রশস্ত; একজন দত্তক পুত্র থাকিলেই ইন্দোর-রাজ্য যথারীতি চালিত হইবে।

অহল্যাবাই মন্ত্রী যশোবন্তের মনোভাব বুঝিলেন। তিনি বিদ্যমান থাকিতে কাহারও পক্ষে স্বার্থসিদ্ধি অসম্ভব; তাই নামমাত্র একজনকে সিংহাসনে বসাইয়া এই ধূর্ত্ত ধীরে ধীরে ইন্দোর রাজ্য গ্রাস করিতে চাহে। তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "তীর্থবাসের সময় এখনও চলিয়া যায় নাই, সে ব্যবস্থা যথাসময়ে হইবে। এক্ষণে আপনার উপদেশ আমি শুনিব—না আপনি আমার উপদেশমত কার্য্য করিবেন?"

বৃদ্ধ মন্ত্রী যশোবন্ত দীর্ঘদিন ইন্দোর-রাজ্যে কার্য্য করিয়াছেন, রাণীর মুখে অকস্মাৎ এই উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বুঝিলেন—ইনি সামান্যা রমণী নহেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে স্বার্থের আগুন তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে; তা' ছাড়া রাণীর এইরূপ অপমানসূচক উত্তরে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইলেন—ইন্দোরের সিংহাসন হইতে অহল্যাবাইকে দূর করিয়া দিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন।

মনোমত লোকও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন। পেশোয়ে বংশের কলঙ্ক রাঘোবা পেশোয়েকে তিনি পত্র লিখিলেন— "ইন্দোর-রাজ্য উত্তরাধিকারিশূন্য, ইচ্ছা করিলে আপনি এই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারেন; আপনার সাহায্যের জন্য আমি প্রস্তুত আছি, মালববাসী পেশোয়ের বংশধরকে নৃপতিরূপে পাইলে ধন্য হইবে।"

রাঘোবা পেশোয়ে রাজ্যলোলুপ হইয়া এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। রাণী অহল্যাবাই ইহা শুনিয়া, মহারাষ্ট্র দেশের সকল নরপতিকে নীতিকুশল পত্র প্রদান করেন। তাঁহার পত্রমর্ম্ম পড়িয়া, সকলেই অহল্যাবাইকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। বরোদার গাইকোয়ার বিশহাজার সৈন্য ইন্দোরে পাঠাইলেন। মহারাজ জন্মুজী ভোঁশ্লা পত্রযোগে জানাইলেন—বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া তিনি শীঘ্রই আগমন করিবেন। অন্যান্য নরপতিগণও যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। পেশোয়ের সিংহাসনে তখন মাধবরাও পেশোয়ে অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর যোগ্য পত্নী রমাবাইয়ের সহিত অহল্যাবাইয়ের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। পেশোয়েকুলকলঙ্ক রাঘোবা মাধবরাও পেশোয়ের পিতৃব্য। মাধব অহল্যাবাইকে জানাইলেন, "আপনার শ্বশুরের রাজ্য গ্রাস-করার প্রবৃত্তি যাহার জন্মিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিবেন—হউক সে পেশোয়ের বংশধর—এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত।"

পেশোয়ে-বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ভবিষ্যতে পাছে পেশোয়ের মর্য্যাদারক্ষায় মাধবরাও পেশোয়ে ইন্দোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই ভাবিয়া অহল্যাবাই মাধবরাও পোশোয়ের মনোভাব অবগত হইলেন। রাঘোবা পেশোয়ের সহিত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে, রাণী অহল্যাবাই যে কূট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা একজন রমণীর পক্ষে অতিশয় বিস্ময়ের বস্তু, সন্দেহ নাই।

অহল্যাবাই রাঘোবা পেশোয়ের যোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তুত হইয়া, সেনাপতি তুকোজীরাওকে ইন্দোরে আহ্বান করিলেন ও তাঁহার হস্তে সৈন্যবিভাগ ও রাজ্যের অন্যান্য কার্য্যভার প্রদান করিয়া, "গাড়রাখেরা" নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

রাঘোবা পেশোয়ে গঙ্গাধরের মুখে অহল্যাবাইয়ের প্রস্তুতির কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভব নহে। বিশেষ, একজন বিধরা রমণীর নিকট এত দূর অপমান মাথা পাতিয়া বরণ করিলে, ভবিষ্যতে লোকের চক্ষে তাঁহাকে অতিশয় হেয় হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

রাণী অহল্যাবাই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিপুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঘোবা পেশোয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যবল দেখিয়া একবার মনে করিলেন—ফিরিয়া যাই, অনর্থক রক্তপাতে লাভ নাই; কিন্তু যশোবন্ত তাঁহাকে নানা কথায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তখন তিনি ইন্দোর আক্রমণ করিবার জন্য শিপ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তুকোজী রাও এই সংবাদ পাইয়া, বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া শিপ্রা নদীর তীর ধরিয়া রাঘোবা পেশোয়েকে বাধা দিতে ছুটিলেন এবং দূতের মুখ দিয়া রাঘোবা পেশোয়েকে

বলিয়া পাঠাইলেন, "যে মুহূর্ত্তে রাঘোবা শিপ্রা নদী অতিক্রম করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে তুকোজীর মুক্ত কৃপাণের সম্মুখে—তাঁর যত বড় বিপুল সৈন্যবাহিনীই হউক—মাথা দিতে হইবে। অতএব পরিণাম ভাবিয়া যেন তিনি শিপ্রা অতিক্রম করেন।"

অকস্মাৎ এইরূপ তেজোব্যঞ্জক, দৃঢ়তাসূচক বাণী শুনিয়া রাঘোবা ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—চতুর্দ্দিকেই ইন্দোর-রাজ্য সুরক্ষিত, এ-যাত্রা রণজয়ের আশা নাই; হয়তো প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে; তাহাও যদি না হয়, ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবরাও পেশোয়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে, এই যুদ্ধে তাঁহার মতামতও লওয়া হয় নাই; এইরূপ ভাবিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তুকোজীকে বলিয়া পাঠাইলেন—যুদ্ধ কামনা করিয়া তিনি আসেন নাই; বৃদ্ধ মল্হর হোলকার পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁর বিধবা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিতেই তাঁর আগমন। তুকোজী তৎক্ষণাৎ অতি সম্মানের সহিত রাঘবা পেশোয়েকে সঙ্গে লইয়া ইন্দোর-রাজধানীতে উপনীত হইলেন, রাঘোবার সৈন্যগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

অহল্যাবাইয়ের ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে, বিনা রক্তে ইন্দোর-রাজ্য রক্ষা পাইল। অহল্যাবাইয়ের রাজত্বকালে মধ্যভারতে নানারূপ অশান্তি উপদ্রবের আগুন জ্বলিতেছিল, দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্র দস্যুগণ, রোহিলা, পিণ্ডারি, জাঠ প্রভৃতি রাজপুত জাতি সেদিন ভারতবর্ষ অবাধে লুণ্ঠন করিতেছে; মোগল সিংহাসন টলমল করিতেছে, গৃহবিবাদে হিন্দুরাজ্য,

উৎসন্নপ্রায়—এই সময়ে একজন নারীর পক্ষে, স্বাধীন রাজ্য রক্ষা করা কতখানি কৃতিত্বের পরিচয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

মলহর রাও'র মৃত্যুকালে ইন্দোর-রাজ্যের ৭৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ছিল। নগদ ১৬ কোটী টাকা ও বহু মণিমাণিক্য তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। অহল্যাবাই ১৬ কোটী টাকা নানাবিধ পুণ্য কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য সকল রাজ্যেই প্রতিনিধি স্থাপন করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পেশোয়ের সিংহাসন-পার্শ্বে ইন্দোরের প্রতিনিধি উপবেশন করিতেন; হায়দ্রাবাদ, মরিচাপাটম, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতার রাজধানীতে ইন্দোরের রাজদূত থাকিয়া, বিভিন্ন রাজশক্তির সহিত আদান প্রদান রক্ষা করিয়া ইন্দোর-রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যগিরির উপর জাম্ নামক দুর্গের যে রাস্তা তাহা অহল্যাবাই বহু ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। কেদারনাথে পথিকদের জন্য ধর্ম্মশালা তিনিই করাইয়া দেন ও বহুসংখ্যক কূপও খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ, আর দ্রাবিড় হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত যত তীর্থ আছে, সর্ব্বত্র অহল্যাবাইয়ের দেবালয় আছে। তিনি নানাস্থানে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মুক্তাদেবী স্বামী-হারা হইলে, তিনি সহমরণ যাত্রা করেন। অহল্যাদেবীর অন্তরে ইহা অতিশয় ব্যথার কারণ হয়। তিনি কন্যার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'মহীশূরে

এক চমৎকার কারুকার্য্য-খচিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সে যুগের বিচিত্র ভাস্কর্য্যের নিদর্শনরূপে ইহা আজিও পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করে।

কাশীর মণিকর্ণিকা, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অহল্যাঘাট আজিও পুণ্যবতীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। তিনি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ষাট বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। অহল্যাবাই দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন বটে, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় হইয়া তাঁহাকে সর্ব্ব দেশবাসীর আপনার জন করিয়াছে। অহল্যাবাইয়ের পুণ্য জীবনের আদর্শ নারীজাতির লক্ষ্যস্থল হউক।

ঝান্সীর রাণী

ভারতের বীর রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণিয়া শেষ করা যায় না। যে দেশের নারীজাতি এমন তপস্বিনী, তেজস্বিনী, সেই দেশের এমন অধঃপতন কেন হইল, ভাবিবার কথা বটে; কিন্তু অধিক চিন্তা করিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হয় না। ভারত ঐক্যবদ্ধ সংহতি গড়িতে শিখে নাই, প্রবল ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া জাতির সমষ্টিপ্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই; কি স্বার্থে, কি পরার্থে, কি ধর্ম্মার্থে আত্মদানের গৌরব নিজের ব্যক্তিত্বকেই সার্থক করিয়াছে, জাতিকে সমৃদ্ধ করে নাই—ব্যক্তিত্বের পুষ্টি কেবল ভোগে ও ঐশ্বর্য্যেই হয় না, আত্ম-বিসর্জ্জনেও ইহা সার্থক হয়, এবং ইহাই জাতির পক্ষে সমধিক ক্ষতিকর। সে দিন জাতির স্বাধীনতা ছিল, মহত্ত্বপ্রকাশের সুযোগ ছিল, আপনাকে বলি দিয়া এক এক জন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ে উত্তেজনার আগুন জ্বলিয়া উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই দেখি—এইরূপ আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে জাতির প্রাণ ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

প্রবল আততায়ীর সম্মুখে হিন্দুনারীর সতীমর্য্যাদা কেমন

করিয়া রাখিতে হয়, পৃথীরাজ-পত্নী যোধাবাঈ তার প্রমাণ দিলেন। তা' ছাড়া বীরনারী তারাবাঈ, যোধীবাঈ, কর্ম্মদেবী স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখিতে পুরুষের ন্যায় আত্মদান করিয়াছেন। স্বাধীনতাযজ্ঞে এইরূপ অসংখ্য নারীপ্রাণ আর কোন দেশে বলি পড়ে নাই। ডুই-মুখো করাতে ভারতের প্রাণ দুইদিক্ হইতেই ধ্বংস পাইয়াছে—একটা বীর জাতির নারী পুরুষ উভয়েই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

বীরত্বের ইতিহাস বটে; কিন্তু এই অশ্রুময় ধ্বংসের ইতিহাস যদি আমাদের আজ ঐক্যবদ্ধ জীবন গড়ার দিকে সঙ্কেত না দিয়া আত্মগর্ব্ব-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, তবে ইহা কার্য্যকরী হইবে না। ধনজনবহুল বিপুল ভারত আত্মত্যাগে অকুণ্ঠ, কেবল সম্মিলিত শক্তির অভাবে ধীরে ধীরে দস্যু-তস্করের করতলগত হইয়াছে। যখন দেখি—ভারতকে নিঃস্ব করিয়াই বিজেতা নিশ্চেষ্ট নয়, তার সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আদর্শ, শিক্ষা, সব কিছু কাড়িয়া লইতে চায়, তখন অশ্রু কোন্ দিক্ দিয়া বেদনার গাথা প্রকাশ করিবে তাহার পথ খুঁজিয়া পায় না, ধমনীর রক্তবিন্দু তুষারের মত শীতল হইয়া যায়। বিশেষ, নারী জাতির অতীত ক্রমেই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দায়ে এমন ভাবে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, যে তাহাতে আমাদের যেটুকু আশা ও শান্তির ক্ষীণ নির্ঝর অন্তঃপুরে ঝরিতেছিল, তাহাও বুঝি রুদ্ধ হইয়া যায়। যুগের সঙ্গে চলার চুক্তিতে প্রাচীন ভারতের পদ্ধতিকে নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করিয়া এতদিন আমাদের হস্তপদই বাঁধা পড়িয়াছিল,

এইবার আমাদের অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত আত্মবিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। হায়, আমাদের অদৃষ্ট!

রমণীর বীরত্বকাহিনী যেখানে আসিয়া চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হইয়াছে, বিয়োগান্ত নাটকের সেই শেষ দৃশ্যটীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।

মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত ঝান্সী নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটীর করুণ ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই।

গঙ্গাধর রাও ইহার স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীবাই। দুর্ভাগ্যবশবতঃ, একটী মাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে গঙ্গাধর রাও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িলেন এবং নিজের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি দামোদর রাও নামক নিজের আত্মীয়পুত্রকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে লর্ড ডালহাউসি ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি বৃটিশ রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন—কোন করদ রাজ্যের নরপতি নিঃসন্তান দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার দত্তকপুত্র পিতার রাজ্যের অধিকারী হইবে না। এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ গঙ্গাধর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। অতঃপর ঝান্সী ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

লক্ষ্মীবাই পতির রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, বডলাট বাহাদুরকে নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন তিনি ক্রোধপূর্ণ কলেবরে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি"—তাঁর এই নির্ভীক প্রশ্নের উত্তর দিতে রেসি-ডেণ্টের মুখে কথা ফুটে নাই, তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

তার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সিপাহীরা মোগলবংশীয় বৃদ্ধ বাহাতুর শাহকে ভারতসম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। ঝান্সীতে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তথাকার ডেপুটি কমিশনর সাহেব নিরুপায় হইয়া এই সময়ে লক্ষ্মীবাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ইংরাজের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন; তত্রাচ এই বিপদের দিনে ইংরাজ রমণী ও বালকবালিকা-দিগকে নিজ প্রাসাদে আশ্রয় দিলেন।

ঝান্সীর তুর্গ অধিকার করিয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণ রাণীর প্রাসাদ আক্রমণ করিল। রাণী তাহাদিগকে অলঙ্কার ও অর্থাদি দিয়া বিদায় দিলেন। সিপাহীরা রাণীকেই ঝান্সী রাজ্যের মালিক বলিয়া ঘোষণা করিল।

ঝান্সী রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইংরাজ তখন ভারতব্যাপী বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত। নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায়, ঝান্সীর প্রজাবৃন্দ যৎপরোনাস্তি তুর্দ্দশা ভোগ করিতে লাগিল। লক্ষ্মীবাই ইহা দেখিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন ও ইংরাজকে এসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া রাখিলেন।

দশ মাস সেই বিপ্লবের দিনে তিনি যেরূপ কৌশলে ও রাজনীতিক বুদ্ধিচাতুর্য্যে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা

নারীর পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। এই অল্প দিনেই তিনি সেনাদল গড়িয়া তুলিলেন, নিজ রাজ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেও উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে স্বজাতিবিরোধের আগুন নিভাইতে খণ্ড-খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের সংবাদ তিনি ইংরাজশক্তিকে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু ঝান্সীর রাণী সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়া নিজরাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন, এই ধারণা ইংরাজের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সেনাপতি সার হিউজ রোজ বিপুল সৈন্য লইয়া ঝান্সী আক্রমণে অভিযান করিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাই এই আক্রমণনিবারণের জন্য প্রস্তাব পাঠাইলেন; কিন্তু ইংরাজ যাহা চাহে না তাহা কেন হইতে দিবে? কাজেই রাণী আঘাতে আঘাতে উত্তেজিত হইয়া, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, মনুষ্যত্বের দায়েই মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

ঝান্সীর সৈন্যসংখ্যা কেবলমাত্র এগার হাজার, ইংরাজের সহিত এই অল্প সৈন্যবল লইয়া কত ক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? ঝান্সীর রমণীবৃন্দ অসি করে রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। এখনও দুইশত বৎসর হয় নাই, ভারতের রমণীসমাজ ঝান্সীর সমর-প্রাঙ্গনে যে বীরত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ সেনাপতি সার হিউজকেও প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।

লক্ষ্মীবাই তান্তিয়া তোপী নামক একজন বিদ্রোহী নেতার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি সসৈন্যে ঝান্সীর অভিমুখে

আসিতেছিলেন, পথে ইংরাজসৈন্যের হস্তে পরাজিত হওয়ায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

ঝান্সী ইংরাজের হস্তে পতিত হইল। ঝান্সীর ঘরে ঘরে উন্মত্ত সৈনিকদল আগুন ধরাইয়া দিল। ঝান্সী শ্মশান হইল। অসংখ্য নরনারী ইংরাজের হস্তে নিহত হইল। ঝান্সীর ধন-সম্পদ্ অবাধে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কত নারী সতীত্ব হারাইয়া যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গভীর কূপে ঝাঁপ দিয়া সীমন্তিনীগণ আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া এই বিপদের দিনে ইজ্জৎ রাখিয়াছিল। ঝান্সীর সে বীভৎস বিবরণ স্মৃতিপটে উদিত হইলে, চক্ষু আঁধার হয়—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

রাণী লক্ষ্মীবাই নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্যই পৃষ্ঠে অষ্টমবর্ষীয় বালকপুত্রকে বাঁধিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কাল্পীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে তখন ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছে; তিনি তান্তিয়া তোপীর সহকারিণী হইলেন। বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্রদ্বয়—নানা সাহেব ও রাও সাহেব এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া, রাণীকে মাত্র আড়াই শত অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনের ভার দিলেন। লক্ষ্মীবাই অমিতবিক্রমে ইংরাজ সৈন্যের একাংশ পরাজিত করিলেন; কিন্তু রাও সাহেব অধিকাংশ সৈন্য লইয়া অন্যক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়ন করার উদ্যোগ করায়, রাণী তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, নিকটে সিন্দিয়ার সুরক্ষিত গোয়ালিয়ার দুর্গ অধিকার করিতে সঙ্কেত দিলেন। রাণীর নির্দ্দেশে, বিপুল

বিক্রমে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিল, গোয়ালিয়ারের দুর্গ লক্ষ্মীবাইয়ের হস্তগত হইল।

ইংরাজ তখন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত প্রবল সৈন্য লইয়া গোয়ালিয়ার পুনর্গ্রহণের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন সারা দিন যুদ্ধ হইল। নররক্তের নদী বহিল। বিধাতা সেদিন ইংরাজের প্রতি প্রসন্ন! ব্রিটিশের জয়নিশান উড়িল। লক্ষ্মীবাই অশ্ব লইয়া ছুটিলেন; তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ইংরাজসৈন্যও ছুটিল। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—একজন ইংরাজ সৈনিক তাঁহার এক সহচরীকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া প্রবল অসি উত্তোলন করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। আবার ছুট—সম্মুখে খরস্রোতা নদী। ক্লান্ত অশ্ব সে নদী অতিক্রম করিতে চাহিল না। রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। দেখিতে দেখিতে ইংরাজ-সৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরাজয়ের ইতিহাস বটে; কিন্তু আজ ইহা উপন্যাসের মতই মনে হয়। লক্ষ্মীবাই গুরুতর আঘাতে ভূমিশায়িনী হইলেন। সেই শেষ ভারতের বীরনারী—এইখানেই যবনিকা পড়িল। এ জাতি বীরত্বের অভাবে মরে নাই, ইহা কি তাহার নিদর্শন নহে?

উপসংহার

যে যুগে ভারতের আদর্শ রমণী ছিলেন—শৈব্যা, সাবিত্রী, সীতা, অহল্যা, দময়ন্তী, চিত্রা, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সে যুগ ভারতের গৌরব-যুগই ছিল। ভারতের উপকণ্ঠে, অসভ্য বর্ব্বর জাতি সেদিনও ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত লুব্ধ দৃষ্টি লইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু এই ভূমি আক্রমণ করার সাহস তাহাদের ছিল না। সেদিন ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে দেশ-প্রীতির নির্ঝরধারা ঝরিত, তাহাদের অপরাজেয় বাহুবল ছিল; ব্রাহ্মণের ধমনীতে তপস্যার বিদ্যুৎ ছুটিত, ভারতের ধর্ম্ম-রক্ষায় দধীচির ন্যায় আত্মদানে তাঁহাদের কৃপণতা ছিল না। যত বার বিধর্ম্মী, সনাতনধর্ম্ম-বিদ্বেষী, বিদেশী দস্যু ভারত আক্রমণ করিয়াছে, তখনই ব্রহ্মণ্যশক্তির সহিত ক্ষাত্রতেজঃ সম্মিলিত হইয়া ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে ছিল ভারতের কৃতযুগ, নারী সৎ-এর উপাসনায় সতীগর্ব্বে পুরুষের প্রাণে মহাবীর্য্য দান করিত। সে ইতিহাস আমরা তলাইয়া পড়িলাম কৈ—অনুভব করিলাম কৈ?

ভারতের নারী পুরুষের ধর্ম্মরক্ষায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিত। পুরুষের সহিত নারীর এই সম্মিলিত-শক্তি সেদিন দিগ্বিজয় করিয়া ভারতকে মহিমামণ্ডিত করিত।

ভারতের অন্তঃপুরে সেদিন শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ বহিত; ভারতের পুরুষ জাতি এই অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া বীরজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

আজ আমরা কি দেখিতেছি?—আত্মঘাতী জাতি সর্ব্ব-ক্ষেত্রে আত্মনাশের পথই প্রশস্ত করিতেছে, বিপরীত-বুদ্ধি পুরুষ জাতির ন্যায় একদল কুলাঙ্গার তথাকথিত বিদুষীরও আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা ভারতের এই পবিত্র আদর্শ ম্লান করিয়া বর্ব্বর যুগের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রে নারীকে দীক্ষা দিতে উদ্যতা। ইহাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিয়া ভারতের প্রাণে দিব্য শক্তির প্রবাহ বহিয়া আনিবার জন্য আমরা ভারতের নারীকেই আজ আবার মাথা তুলিতে বলি। ভারতের অতীত অগৌরবের বস্তু নহে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আমাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে। আদৌ ইহা হইল কেন, এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষেত্র ইহা নহে—আমরা অন্যত্র ইহার সদুত্তর দিব।

ভারতের নারী হইবে সত্যই পুরুষের সেবিকা। বাধ্যতার ভিতর দিয়া অপার্থিব সেবার জাহ্নবীধারা দুষ্প্রাপ্য। ইহা তাঁহাদের অনাবিল পবিত্র জীবনের স্বেচ্ছাব্রত রূপেই পুরুষ-জাতিকে বল দিবে, বীর্য্য দিবে—তাহাদের গ্লানি দূর করিয়া দেবতার আসনে বসাইবে। পতি-পুত্রের উন্নত জীবনগঠনের এই যে মহাযজ্ঞ নারী তাহা হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। নশ্বর জীবনের আহুতিতে জাতির এই সমৃদ্ধি—ঈশ্বর-বিধান। তাই ভারতের নারী সতী-সাধ্বী, একনিষ্ঠ পতি-পরায়ণা তপস্বিনী, প্রেম ও সেবার প্রতিমা—ভারতের

আশা-কেন্দ্র। যদি কোনদিন আমরা ভারতের জয়পতাকা আকাশের কোলে তুলিয়া ধরিতে পারি—তবে নিবেদিত নারীর উৎসর্গ ভিত্তি করিয়াই তাহা সিদ্ধ হইবে, ইহা অবধারিত জানিও।

আজ দেশের একদল সাহিত্যিক নারীর পবিত্র হৃদয় কলুষিত করায় উদ্যোগী হইয়াছেন। যে বিদেশীর কুক্ষিগত হইলে আমরা নিশ্চিহ্ন হই, তাহাদেরই ইহারা পোষ্যপুত্র। আমাদের পায়ের তলা হইতে মৃত্তিকা সরাইয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র ইহার মধ্যে আছে। নারীজাতিকে আমরা মুক্তি-ব্রতের সহকারিণী করিব; কিন্তু সাবধান, এই অসৎ সংসর্গ হইতে তাহারা যেন নিজেদের সতত দূরে রাখার সংযম শিক্ষা করে—বাহিরে পা বাড়াইবার পূর্ব্বে এই সতর্কতা তাহাদের রক্ষাকবচ হইবে।

আমাদের পুরুষ জাতি স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রে বিচলিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গাই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বিজাতীয় ধারণা করিয়াছিল। তাহার কুফল আজ দেখা দিয়াছে—আমরা কেবল অস্ত্রবলের সাহায্যে নয়, শাসন-যন্ত্রের নিষ্পেষণে নয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের দেশ অন্যের হাতে ধীরে ধীরে তুলিয়া দিতেছি। ব্যাভিচারপরায়ণ না হইলে আয়ুঃক্ষয় হয় না, শক্তি লোপ পায় না। নারীকে ব্যাভিচারের আদর্শে আকর্ষণ করিলে তাহাদের অবাধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ একদিকে যেমন প্রশস্ত হয়, অন্য দিকে ভারতের দুর্গতির মাত্রা অধিকতর বাড়িয়া উঠে। আমাদের ধরাপৃষ্ঠ

হইতে মুছিয়া যাওয়ার এই দুর্নীতি নারী পুরুষ মিলিয়াই দূর করিতে হইবে। পুরুষ হইবে সৎ, নারী হইবে সতী—এই সুমহান্ আদর্শের প্রভাবেই আমরা প্রতি-ক্রিয়ামূলক সমাজ-বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় অধিকতর বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধরিয়া মাথা তুলিব। নারী জাতিকে এই দিকে এইজন্য বার বার সতর্ক দৃষ্টি প্রসারিত করিতে বলি।

এইবার আমরা দেখিব—আমাদের নারী জাতি কোন অবস্থায় অসহায়া নহেন। কল্পনা করিয়া দুঃখটা অধিক না বাড়াইলে স্থিতিশীল সমাজশক্তি বিক্ষুব্ধ হয় না এবং এই বিক্ষুব্ধ সমাজ-বক্ষ ছিনিয়া সুরভি-কুসুম নারীজাতিকে পাপের খোরাক করা তখন সহজ হইয়া উঠে। আমাদের সমাজশক্তি দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার দায় তাই শুধু পুরুষের নহে। সমাজ-গঠনের মূলে কেবল পুরুষই বর্ত্তমান নহে। ইহা উভয়ের মিলিত জীবনের অভিব্যক্তি। তাই ভারতের সমাজরক্ষা আমাদের যুক্ত জীবনের তপস্যায় সিদ্ধ করিতে হইবে।

নারীর কি এমন অবস্থা ঘটিয়াছে—যে পুরুষের অপেক্ষা তাহারা হেয়, ঘৃণ্য হইবে? মনে রাখিতে হইবে, ভারতের প্রাণ—তপস্যা। ভারতের জীবন সার্থক করিতে হইলে তপস্যাই আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাতে বিমুখ হইলেই কেবল নারীর দুর্গতি নহে, পুরুষও অধম হয়। উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা যদি সর্ব্বদা সমাজের প্রাণে আগুণের মত জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে স্বভাবজীবনের সহজ গতিটা যে রুদ্ধ হইবে, ইহা কিছু অস্বাভাবিক কথা নহে। এই

ঊর্দ্ধমুখী জীবনপ্রবাহসৃজনের পথে অনেক অসুবিধা, অনেক বাধা। যে নীচের স্বভাব আমাদের সম্মোহিত করিয়াছে তাহা হইতে মুক্তির প্রয়াস প্রথমে দুঃখই সৃজন করে, ইহা অনিবার্য্য ; তাহার জন্য আমাদের ভীত হইলে চলিবে না— সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে অশেষ দুঃখই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

নারীর এক মূর্ত্তি—কৌমার্য্য। যাহারা চিরকুমারী থাকিতে চাহে, বাহিরের সুবিধা ও সাহায্যের অভাবে যে ইহা সম্ভব হইবে না তাহা একেবারেই মূল্যহীন কথা। সত্য কামনা কোন দিন কি কোথাও ব্যর্থ হইয়াছে ? চাই প্রত্যেক নারীর তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্থির করার দৃঢ় সঙ্কল্প। যে সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে জীবনমরণ পণ জাগে না— তাহা সঙ্কল্প নহে, ভাবুকতার উপাদানে গড়া বলিতে হইবে। প্রেরণা সত্য হইলে অশেষ বিপত্তি পথ আগুলিয়া ধরিলেও, শেষে তাহাই পদচুম্বন করিয়া সহায় হইবে। নারী আপনার সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ আপনার হাতেই গড়িয়া লইবে। ইহাই তো নারীর সত্য মুক্তি, খাঁটি জয়ের নিদর্শন !

নারীর অন্য এক মূর্ত্তি—বৈধব্য। যাঁহারা স্বামীর সংস্পর্শ মাত্র লাভ করে নাই, স্বামী-বস্তু হৃদয়ের নিত্য নিধি বলিয়া অনুভব করার সুযোগ পায় নাই, তাহাদের পুনঃ পরিণয় প্রশস্ত। কিন্তু প্রেম ব্যাভিচারে ম্লান হয়, প্রেমের আগুন কোথাও নিষ্ঠাভঙ্গে পুনঃ-প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখা যায় নাই। প্রেমের স্বরূপ নিষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে, প্রেমের আশ্রয় শরীর

নয়, আত্মা। এইজন্য মৃত্যু নারীর আশ্রয়তত্ত্ব চুরি করিতে পারে না—চিন্ময় মূর্ত্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে। বিধবার এই যে দিব্য আদর্শ ভারতেই ইহা মূর্ত্তি লইয়াছিল। এই পবিত্র পতিধর্ম্মপরায়ণা নারীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া, অদূরদর্শী পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানীর সংস্কারবিধি কেবল অকল্যাণেরই সৃষ্টি করিতেছে।

কিন্তু এই বিপরীত আদর্শের মাঝে ভারতের বৈধব্যধর্ম্ম আরও সমুজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করিবে। এই মহাব্রত সাধনে নারী তো ব্যর্থ হইবে না, প্রবৃত্তি জয় করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে হীন ভোগবৃত্তি হইতে উপরে উঠাইয়া "জগদ্ধিতায় বহুজন-হিতায়" দেশকল্যাণে নিয়োজিত করিবে। বৈধব্যব্রত-ধারিণী দেশের রমণীগণ স্বামীহীনা বলিয়া জীবন ব্যর্থ হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না। ইহাতে নিজের জীবনের অধঃপাতের সঙ্গে, জাতিকেও শক্তিহীন করা হয়।

শেষে, পরিণীতার কথা। পরিণয়—জীবনের মহাব্রত। নারী—পুরুষের ইচ্ছারূপিণী মহাশক্তি। সৎ হইতেই এই ইচ্ছার উৎপত্তি। অতএব নারী নিঃসংশয়ে পতির হিতকামনা করিবে। নারীর কোন অবস্থাই সহজ নহে; নারী কেন, খাঁটী মানুষ হইতে হইলে পুরুষকেও কঠোর তপস্যা করিতে হয়। কুমারী-ব্রতধারিণী নারীকেও যেমন অসংখ্য বিপদ্ ও প্রলোভনের মধ্যে নিজেকে অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পবিত্র রাখিতে হয়, বৈধব্যব্রতও যেমন অল্প তপস্যায় সিদ্ধ হয় না, বিবাহিতা নারীকেও তদ্রূপ তপস্যার দ্বারাই পুরুষের স্বরূপ

যে সত্যবস্তু তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এই তপস্যাই কখন কখন দুষ্টা প্রকৃতির সাহায্যে রুদ্রবেশে দেখা দিবে, অত্যাচার আঘাত অপমান সৃষ্টি করিবে; কিন্তু বিচলিত হইলে চলিবে না। নারী-জীবনের সার্থকতাই হইতেছে—পুরুষের ইচ্ছাকে সার্থক করা। নারী চিন্ময়ী আনন্দময়ী—এই স্বরূপবস্তু-লাভ জীবনের সকল পর্য্যায়ের লক্ষ্য।

পতি লাভ করিয়া পত্নী প্রভাতের প্রজাপতির মত হেলিয়া দুলিয়া সোহাগে গরবে কেবলই যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবে, ইহা জীবনের সত্য নয়। জীবন—যোগ। পরিণীতা স্বামীর সহিত সংযুক্তজীবনের মধু আস্বাদে অমৃতময়ী হইবে, বিধবা অপাপবিদ্ধ অমর সত্তার অনুধ্যানে বিশুদ্ধ পাবকের ন্যায় সমাজ-জীবন পূত পবিত্র করিয়া তুলিবে, কুমারী পুরুষোত্তমের চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া অনন্ত শক্তিশালিনী দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া ভারতের জয়গান করিবে—এই পরম শিক্ষা হইতে সমাজ বঞ্চিত হওয়ায় দেশে মেকীর আদর বাড়িয়াছে; জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

ভারতের এই সুমহৎ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জীবন যেখানে উদ্যত হয়, দেখিও—সেইখানেই উন্মার্গগামী, আত্ম-বঞ্চিত, পরপ্রসাদপুষ্ট অসংখ্য কুক্কুর চীৎকার করিতে থাকে। মিঃ পিল্‌চার, মিস্ মেয়ো প্রমুখ বিদেশী নারী পুরুষের বিকট চীৎকারই ইহার জ্ঞাপক নয়, উপসভ্যতায় আমরা আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইয়া নিজেরাই অধিক গণ্ডগোল করি—অধিক করিয়া আত্মঘাতী হই।

নারীর এই আদর্শই আজ দেশের সম্মুখে বড় করিয়া ধরিতে হইবে, যে তাহাদের স্বেচ্ছাচার, স্বাতন্ত্র্যবোধের আন্দোলন বিপ্লবসূচক, উহাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ লাভ হয় না। নারী যদি স্বেচ্ছায় আত্মদান না করে, সমাজ-বেদীতলে পুরুষের প্রাণ জাগিয়া উঠিবে না, যে অন্ধ প্রকৃতির বাঁধনে এ জাতি আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ তাহা টুটিবে না। দেখিও—নারীর আত্মদান যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই পৌরুষ জাগিয়াছে; দেশ, সমাজ, জাতি হিমালয়ের মত মাথা তুলিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

হে নারী! মনে রাখিও—আত্মমর্য্যাদার বিমল সৌরভ, যাহার জয়-নিশান জীবনের শেষেই বায়ুমণ্ডলে আন্দোলিত হয়। পুরুষের ললাটে জয়টীকা শোভা পাইলেই জাতি জগজ্জয়ী হয়। নারীই তার মূল—ইহাই নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, নারীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

ওগো ভারতের নারী—জীবন ভারতের আদর্শে গড়িয়া তোল। যদি কুমারী থাকিতে চাও, যৌবনশ্রী চীরবসনে ঢাকা দিয়া, প্রসন্নমুখী শান্ত সুবিমল দৃষ্টিতে জগতের হিত-কামনায় সর্ব্বত্যাগী হও। হে ব্রহ্মচারিণী, প্রবৃত্তির আঘাত যত অল্প সহিতে হয়, তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। তোমায় পায়ে হাঁটিয়া সেই বিদ্যালয়ে ধূলির আসনে বসিতে হইবে—যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের ধুনি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়াছে। তোমার জগতের কল্যাণসাধন ব্যতীত আর কোন প্রয়োজন নাই; আত্মপোষণের দায় তোমার নহে। দেশজননীর সাধের

দুলালী, আবর্জ্জনার ভার তোমাদের বহিতে হইবে কেন ! ভাবিও না, তুমি অসহায়া ; সঙ্কল্প সুদৃঢ় কর—তপস্যার মর্ম্ম বুঝিবে। আপনার সঙ্কল্পবলেই নূতন সৃষ্টি কেমন করিয়া মূর্ত্তি ধরে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত হইবে। সে সৃজন যে তোমারই মানস-ঘন রূপের ছায়ামূর্ত্তি—তাহা তাই তোমারই মত রমণীয়, সহজ ও চিরসুন্দর !

স্বামিহীনা, কে বলিল তুমি কাঙ্গালিনী ! ভারতের স্বর্গপুরী তোমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য তোমার চরণতলগত। আবর্জ্জনাবাহী, পয়ঃপ্রণালী বলিয়া তোমায় যাহারা ঘৃণা করে, দুঃখপ্রকাশ করে, তারা অন্ধ। ভারতের ভাগ্যধর পুরুষ কল্পলোকে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির সহায়েই যে গড়িয়া উঠে, মরিয়াও এ জাতি যে চিরজীবী হয় সে যে গো তোমারই তপস্যায় ; এই পবিত্র বৈধব্যব্রত যদি ভারতের বুক হইতে মুছিয়া যায়, আমাদের ভবিষ্যৎ আঁধার হইয়া পড়িবে। ভারতসমাজের মেরুকঙ্কালস্বরূপা এ জাতির বৈধব্য—ঈশ্বরের এই বজ্রবিধান জাতির কল্যাণ-হেতু ইহা তোমরা ভুলিও না।

জীবন লইয়া জাতির উন্নতি। সে জীবন যদি আদর্শ ভ্রষ্ট হয়, উল্টা গতি ধরে, মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে হইবে জগতের হাঁকাহাঁকি শুনিয়া বিচলিত হইও না, আত্মাকে জাগাও। নারীর শিক্ষা শুধু পুস্তক অধ্যয়ন করা নহে, সভ্যতা কারুকার্য্য, চিত্রবিদ্যা নহে, মুক্তশিরে, অর্দ্ধ-উলঙ্গ বেশে পথে পথে সগর্ব্বে বিচরণ নহে ; নারী তুমি, আত্মদানের বর্ণপরিচ

কণ্ঠস্থ কর। কি কুমারী, কি বিবাহিতা, কি বিধবা—যদি তোমাদের আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয়, ভারতের ভস্মস্তূপে যে মহাশক্তি স্তিমিত, সুপ্ত, তাহা পুনর্জাগ্রত; প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, জীবনের কূলে কূলে মন্দাকিনীধারা বহিবে; শ্রী, সম্পদ্, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শিক্ষা, সাধনা তখন কিছুর অভাবেই আমরা দীন হইয়া থাকিব না।

নারীর এই পবিত্র আত্মদান যে শিক্ষায় কুণ্ঠিত, যে অপ্রত্যয় নারীকে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিতে চায়, তাহা জাতির মধ্যে ভেদের পর ভেদ সৃজন করিয়া আমাদের চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখিবে। আমরা আজ তাহা হইতে মুক্তি চাই। অসংখ্য দুঃখের মধ্যে, শরীর ও মনের সন্তাপ হাসিমুখে বরণ করিয়া নারী পুরুষ একযোগে ঐক্য ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা লইব। আমরা চাই—ভাগবত-তন্ত্র, ভাগবত ইচ্ছার সিদ্ধযন্ত্র রূপেই আমরা ভারতসমাজে সিদ্ধজীবন লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিব।

এই একনিষ্ঠ কামনা নানা মূর্ত্তিতে জাতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করুক। এই ঐক্যতান বাদনের অসংখ্য যন্ত্র—কুমারী, বিধবা, সধবা, সন্ন্যাসী, গৃহী, ব্রহ্মচারী সকল রূপেই যেন ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের পবিত্র পুষ্পার্ঘ্যের ন্যায় শোভা পায়—জাতির সিদ্ধ-তীর্থ যে এইখানেই, ইহা কি নারীজাতি আজ অস্বীকার করিবে!

'প্রবর্ত্তক'-সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

নবভারতের প্রাণদাতা নরেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বিবেকানন্দে পরিণত হইলেন—সেই যুগ-সাধনার কেন্দ্রচক্র 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহারই জ্বলন্ত ইতিহাস মতিবাবুর অগ্নিময়ী লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৫০ খানি চিত্রে সুশোভিত, ২য় সংস্করণ—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ত্যাগ ও তপস্যার জ্বলন্ত আদর্শ ভিত্তি করিয়া পবিত্র দাম্পত্য জীবনের যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গভীর নিগূঢ় মর্ম্ম, সাধনার দৃষ্টি দিয়া নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত ও আলোচিত হইয়াছে—ভবিষ্য-সমাজসৃষ্টির ইহা সিদ্ধ সঙ্কেত। বহুচিত্রে সুশোভিত, ১৫০ পৃষ্ঠার বই, মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র।

আত্মসমর্পণ যোগ

দীক্ষা, সাধনার প্রণালী, শুদ্ধি ও দেবজীবন লাভের উদ্দেশ্যে যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন, তরুণ সাধকের উপযোগী সরল প্রাঞ্জলভাষায় মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তাহাই বুঝান হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

যৌগিক সাধন

এই বইখানিতে মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলির কথা, তাহাদের কার্য্যাদির বিবরণ খুব সরলভাবে বুঝান হইয়াছে। এখানি শ্রীঅরবিন্দের Yogic sadhan'এর অনুবাদ। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

স্বদেশীযুগের স্মৃতি

পরাধীন জাতির প্রাণ-জাগার, সেই অমর-কাহিনী—স্বদেশীযুগের মন্দাকিনী প্রবাহ বাংলার বুকেই ঢল দিয়া প্রথম নামিয়াছিল—সারা ভারত আজ সেই পুণ্যভাবস্রোতে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়াই মুক্তি তীর্থে ছুটিয়াছে। যে নবভাবে এ মহাজাতির অভ্যুত্থান, তাহা নানা ঘটনা পরম্পরায় বহু কারণ সংযোগে সংগঠিত হইয়াছে; সেইগুলি তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক ও স্বদেশপ্রেমিকের মমতাপূর্ণ স্বচ্ছ মনীষার আলোকে মনস্বী লেখক ফটোর মত তুলিয়া ধরিয়াছেন। মতিবাবুর বিবৃত কাহিনী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত, কল্পনা বা অনুমানমূলক নহে, কাজেই ইহা একাধারে ইতিহাসের কঠোর বাস্তব সত্য, কিন্তু লিপিচাতুর্য্যে উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর, হৃদয়গ্রাহী ও সুপাঠ্য। বহুচিত্রে সুশোভিত। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা।

লীলা

অনন্ত যুগ ধরিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার যে অনন্ত নাট্যলীলা প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন, সেই রহস্য উপলব্ধিপূর্ব্বক সকলেই যাহাতে ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে, এই ভাবে ইহা লিখিত। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

নারী মঙ্গল

নারীসমস্যা সম্বন্ধে নূতন দিক্ দিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী ও জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ তরুণ দেশসাধক ও সাধ্বিকাগণ ইহার মধ্যে দিব্যজীবন ও নবসমাজ সাধনারই ইঙ্গিত পাইবেন। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

ভারত-লক্ষ্মী

ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার দর্পণে নারীর নারীত্ব সগৌরবে সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। ইতিহাসের খরস্রোতে কীর্ত্তিময়ী ভারতের নারীজাতি—জননী, ভগ্নী, পত্নী, কন্যা, সধবা, বিধবা, কুমারী—রাজেশ্বরী ও ব্রহ্মবাদিনী—কি ছিল, কি হইয়াছে, কি হইবে—তাহারই আলেখ্য অখণ্ড দৃশ্যপটে অগ্নিময়ী ভাষায় অঙ্কিত। প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার অবশ্য পাঠ্য, বহুচিত্রে সুশোভিত, উপহার উপযোগী পুস্তক। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ভারতীর মন্দির

সুখ শান্তি মানুষের আনায়াসলব্ধ সামগ্রী। মানুষ তাহার নিজ বিকৃত বুদ্ধির দোষে তাহাকে দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছে। 'ভারতীর মন্দিরে' ইহাঁরই আলোচনা ও সমাধানের উপায় গল্পাকারে আঁকিয়া ধরা হইয়াছে। প্রত্যেক গল্পটী উদ্দেশ্যমূলক; আর সে উদ্দেশ্য এতই সুস্পষ্ট যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছবিটী চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

অরবিন্দ মন্দিরে

অরবিন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বইখানিতে সেইগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। যোগ, সঙ্ঘ ও সাধন সম্বন্ধীয় অনেক কথা এই পুস্তকে আছে। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

সাধনা

যে সাধনায় দেশকর্ম্মীর চরিত্র গড়িবে, ভগবানের নির্দ্দেশ বুঝিয়া লীলার পথে চলিবার ভাব ও কৌশল আয়ত্ত হইবে, তাহাই এই বইখানিতে স্পষ্টাক্ষরে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।